ইউএসটিসি আবদুল্লাহ আল হারুন গ্যালারি

চির ভাস্বর চট্টলা সন্তান

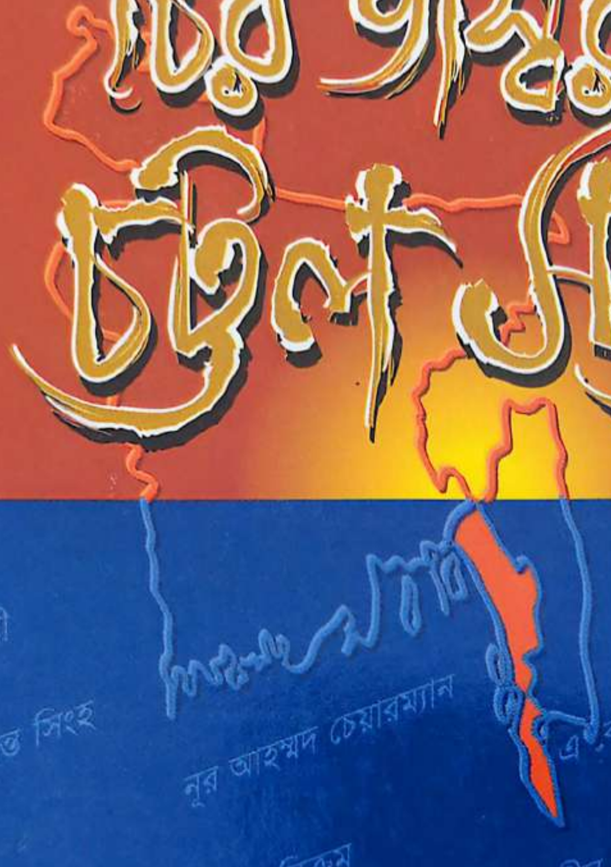

জহুর আহম্মদ চৌধুরী

অনন্ত সিংহ

নুর আহম্মদ চেয়ারম্যান

এ কে এম ফজলুল কাদের চৌধুরী

মাস্টারদা সূর্যসেন

আহাম্মদ ছফা

ড. অলি আহাম্মদ বীর বিক্রম

আলহাজ্ব এ বি এম মহিউদ্দীন চৌধুরী

আনোয়ারুল আজিম ব্যারিষ্টার

এ কে খান

কল্পনা দত্ত

আব্দুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

জাকির হোসেন গভর্ণর

রমেশ চন্দ্র শীল

নবীন চন্দ্র সেন

দেশ প্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস

বিশুদ্ধানন্দ মহাথের

গণেশ ঘোষ

ইউএসটিসি আবদুল্লাহ আল হারুন গ্যালারি

প্রকাশনায় :

ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম (ইউএসটিসি)

বীর চট্টলা
যাঁদের অবদানে ধন্য,
যাঁদের নিয়ে আমরা গর্বিত
তাঁদের উদ্দেশে

ইউএসটিসি আবদুল্লাহ আল হারুন গ্যালারি

চির ভাস্বর

চট্টল সন্তান

মার্চ ২০০৫

ভাবনায়

আবদুল্লাহ্ আল হারুন চৌধুরী

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

তথ্য সংগ্রহ

আবদুল্লাহ্ আল হারুন চৌধুরী

সহযোগিতায় : মো. জসীম উদ্দীন

সম্পাদনায়

এ আই ইসলাম

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে

ফজলুল কাদের চৌধুরী

শোয়েব ফারুকী

(প্রিন্ট ক্র্যাফ্‌ট, চট্টগ্রাম)

প্রচ্ছদ

বাবু ভৌমিক

তত্ত্বাবধানে

মো: হাসান কাউসার

মূল্য

২৫০.০০ টাকা

(বিক্রয়লব্ধ অর্থ জনকল্যাণে)

প্রকাশনায়

ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম (ইউএসটিসি)

সূচী

১.	হাবিলদার রজব আলী	-	-	-	১৭
২.	নবীন চন্দ্র সেন	১৮৪৭	-	১৯০৯	১৮
৩.	কাজেম আলী মিঞা	১৮৫২	-	১৯২৬	১৯
৪.	আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ	১৮৭১	-	১৯৬৩	২০
৫.	মহিম চন্দ্র দাশ	১৮৭১	-	১৯৪০	২১
৬.	সাবিত্রী দেবী	১৮৭১	-	১৯৪০	২২
৭.	আবদুল হক দোভাষ	১৮৭৪	-	১৯৫০	২৩
৮.	মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী	১৮৭৫	-	১৯৫০	২৫
৯.	গণ কবিয়াল রমেশ চন্দ্র শীল	১৮৭৭	-	১৯৬৭	২৭
১০.	চারু বিকাশ দত্ত	১৮৭৮	-	১৯৩৬	২৮
১১.	খান বাহাদুর আবদুচ ছত্তার	১৮৮০	-	১৯৪৭	২৯
১২.	দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	১৮৮৫	-	১৯৩৩	৩১
১৩.	খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী	১৮৮৬	-	১৯৬২	৩২
১৪.	বেণী মাধব বড়ুয়া	১৮৮৮	-	১৯৪৮	৩৪
১৫.	নূর আহম্মদ চেয়ারম্যান	১৮৯০	-	১৯৬৪	৩৬
১৬.	অম্বিকা চক্রবর্ত্তী	১৮৯২	-	১৯৬০	৩৮
১৭.	ডা. এম এ হাশেম	১৮৯৪	-	১৯৭০	৩৯
১৮.	মাষ্টারদা সূর্য সেন	১৮৯৪	-	১৯৩৪	৪১
১৯.	ইসলাম খাঁ	১৮৯৬	-	১৯৭৪	৪৩
২০.	আনোয়ারুল আজিম ব্যারিষ্টার	১৮৯৭	-	১৯৬৫	৪৫
২১.	জাকির হোসেন গভর্নর	১৮৯৮	-	১৯৭১	৪৭
২২.	মাহবুব উল আলম	১৮৯৮	-	১৯৮১	৪৯
২৩.	আব্দুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার	১৮৯৮	-	১৯৬২	৫১
২৪.	শেখ রফিউদ্দিন আহমদ ছিদ্দিকী	১৮৯৮	-	১৯৬৮	৫৩
২৫.	ডা. মোহাম্মদ ওমর	১৮৯৯	-	১৯৫১	৫৫
২৬.	ড. মুহাম্মদ এনামুল হক	১৯০২	-	১৯৮২	৫৭
২৭.	আবদুর রহমান মাষ্টার	১৯০২	-	১৯৭৭	৫৯
২৮.	আবুল কাশেম সাব-জজ	১৯০২	-	১৯৭৯	৬১
২৯.	অনন্ত সিংহ	১৯০২	-	১৯৮০	৬৩
৩০.	ওবায়দুর রহমান নিজাম	১৯০২	-	১৯৭০	৬৪
৩১.	সোলেমান চৌধুরী	১৯০৩	-	১৯৬৩	৬৬
৩২.	অধ্যাপক আবুল ফজল	১৯০৩	-	১৯৮৩	৬৮
৩৩.	এ কে খান	১৯০৫	-	১৯৯১	৭০

৩৪.	গণেশ ঘোষ	১৯০৫	-	১৯৯৩	৭২
৩৫.	লোকনাথ বল	১৯০৭	-	১৯৬৪	৭৩
৩৬.	বিনোদ বিহারী দত্ত	১৯০৮	-	-	৭৪
৩৭.	আলহাজ্ব মাহমুদুন্নবী চৌধুরী	১৯০৯	-	১৯৬৫	৭৫
৩৮.	প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার	১৯০৯	-	১৯৩২	৭৬
৩৯.	বিশুদ্ধানন্দ মহাথের	১৯০৯	-	১৯৯৪	৭৭
৪০.	ড. সানাউল্লা ব্যারিষ্টার	১৯১০	-	১৯৬৩	৭৯
৪১.	মোহাম্মদ লোকমান খান শিরওয়ানী	১৯১০	-	১৯৬৯	৮১
৪২.	কালীপদ চক্রবর্ত্তী	১৯১০	-	১৯৯০	৮৩
৪৩.	মাহবুব উল আলম চৌধুরী	১৯১০	-		৮৪
৪৪.	কল্পনা দত্ত	১৯১০	-	-	৮৫
৪৫.	কবি অহিদুল আলম	১৯১১	-	১৯৯৮	৮৬
৪৬.	বিনোদ বিহারী চৌধুরী	১৯১১	-		৮৭
৪৭.	অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন আহমদ	১৯১৪	-	১৯৯৪	৮৯
৪৮.	মৌলভী মীর আহম্মদ	১৯১৫	-	১৯৭৩	৯১
৪৯.	বাদশা মিঞা চৌধুরী	১৯১৫	-	১৯৬৭	৯২
৫০.	জহুর আহম্মদ চৌধুরী	১৯১৫	-	১৯৭৪	৯৪
৫১.	পুর্ণেন্দু দস্তিদার	১৯১৬	-	১৯৭১	৯৬
৫২.	এ কে এম ফজলুল কাদের চৌধুরী	১৯১৯	-	১৯৭৩	৯৭
৫৩.	ভাষা সৈনিক অধ্যক্ষ আবুল কাসেম	১৯২০	-	১৯৯১	৯৯
৫৪.	এম এ আজিজ	১৯২১	-	১৯৭১	১০১
৫৫.	অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ	১৯২২	-	২০০৩	১০৩
৫৬.	চট্টল গবেষক আবদুল হক চৌধুরী	১৯২২	-	১৯৯৪	১০৫
৫৭.	এস এম শফিউল আজম	১৯২৩	-	১৯৯১	১০৬
৫৮.	অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দীন আহম্মদ	১৯২৩	-	২০০৪	১০৮
৫৯.	এম আর সিদ্দিকী	১৯২৬	-	১৯৯২	১১০
৬০.	ডা. এ এফ এম ইউসুফ	১৯২৬	-	২০০৩	১১২
৬১.	ডাঃ কামাল এ খান	১৯২৬	-	২০০৩	১১৪
৬২.	জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম	১৯২৮	-		১১৬
৬৩.	ড. আবদুল করিম	১৯২৮	-		১১৮
৬৪.	আলহাজ্ব এম এ সালাম	১৯৩৮	-	২০০২	১২০
৬৫.	কে এম শিহাব উদ্দীন	১৯৪০	-		১২২
৬৬.	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস	১৯৪০	-		১২৪
৬৭.	ড. অলি আহাম্মদ বীর বিক্রম	১৯৪১	-		১২৬
৬৮.	আহম্মদ ছফা	১৯৪৩	-	২০০১	১২৮
৬৯.	আলহাজ্ব এ বি এম মহিউদ্দীন চৌধুরী	১৯৪৪	-		১৩০
৭০.	অধ্যাপক মন্‌সুর মুসা	১৯৪৫	-		১৩২

সম্পাদকীয়

সাহিত্যিক মাহবুব উল আলম-এর ভাষায়, 'চট্টগ্রাম এক অপূর্ব সুন্দর দেশ, বাংলাদেশের বিরাট সমতল অংশ যখন সমুদ্র গর্ভ থেকে দেব আর্যদের পাতাল নামে পরিচিত ছিল, চট্টগ্রাম তখনও মাথা উঁচু করে জেগে'।

চট্টল-গবেষক আবদুল হক চৌধুরী লিখেছিলেন বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত বিহার খৃষ্টীয় দশম শতকের দিকে স্থাপিত হয়েছিল এই চট্টগ্রামের চক্রশালায়। বৌদ্ধরা এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। যার অধ্যক্ষ ছিলেন বৌদ্ধভিক্ষু প্রজ্ঞাভদ্র।

এই চট্টগ্রামে আরব থেকে এসেছিলেন ধর্ম প্রচার করতে বহু আওলিয়া-দরবেশ। যাদের পদচারণায় চট্টগ্রাম হয়ে উঠেছিল সত্যিই এক অপূর্ব সুন্দর দেশ। কিন্তু পলাশীর আম্র-কাননে ব্রিটিশ বেনিয়া ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়-এর পর শুরু হল সমগ্র বাংলা তথা চট্টগ্রামের উপর নানা বঞ্চনা ও শোষণ। বিনা প্রতিবাদে যেতে দেয়নি এসব চট্টগ্রামের সাহসী সন্তানেরা। মাষ্টারদা সূর্য সেন-এর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তার অকাট্য প্রমাণ।

২০০ বছর শেষে ব্রিটিশদের বিদায়ের পর এদেশের ঘাড়ে চেপেছিলো পাকিস্তানী শাসন। তাদের ২৪ বছরের বৈষম্যমূলক শাসন ও বিমাতাসুলভ আচরণ চট্টগ্রামবাসী মেনে নেয়নি। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা ঘোষণা, স্বাধীনতা-যুদ্ধ, আরো অনেক আন্দোলন, বিদ্রোহ, জাতির মুক্তির জন্য চট্টগ্রামের পবিত্র মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল।

যা আজ ইতিহাস। স্বাধীনতা-উত্তর ৩২ বৎসর আমরা আমাদের দ্বারা শাসিত হচ্ছি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছুর পরিবর্তন হলেও শোষণ, বঞ্চনা ও অবহেলা চট্টগ্রামের কপাল থেকে মুছেনি। চট্টগ্রাম এদেশের অর্থনীতির সিংহভাগের নিয়ন্ত্রক। শাসক শ্রেণীর বিমাতাসুলভ আচরণে চট্টগ্রাম তার গৌরব হারাতে হারাতে এখন প্রায় নিঃস্ব। তার উঁচু মাথা এখন ন্যুব্জ হয়ে আসছে। এর প্রতিকারের দাবি প্রতিটি চট্টগ্রামবাসীর।

উপরোক্ত সব বিবেচনা করে চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক বিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম চট্টগ্রামের ছায়া-সুনিবিড় পাহাড়-ঘেরা মনোরম পরিবেশে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, (ইউএসটিসি)। এটি আজ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ভাষা-সৈনিক আবদুল্লাহ্ আল হারুন (ভারপ্রাপ্ত প্রোভিসি, ইউএসটিসি) চট্টগ্রাম-এর মনীষীদের ছবি সংগ্রহ করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে । সেইগুলিকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ একটি 'চির ভাস্বর চট্টল সন্তান' স্মরণিকা প্রকাশ ও গ্যালারি স্থাপন করার যে মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা নতুন প্রজন্মকে আলোর পথ দেখাতে সক্ষম হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এই গ্যালারিতে যাঁদেরকে স্থান দেয়া সম্ভব হয়েছে, তাঁরা ছাড়াও আরো যাঁরা এর বাইরে আছেন তাঁদের ছবি ও জীবন কাহিনীর সন্ধান কেউ দিলে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে তা গ্রহণ করব ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেব।

এ আই ইসলাম

মার্চ ২০০৫

বাণী

এম মোরশেদ খান এম, পি

মন্ত্রী

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চিটাগাং (ইউএসটিসি) দেশবাসীর প্রত্যাশার আলোকে এর অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি বর্হিবিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়ন করছে জেনে আমি আনন্দিত। দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। ইউএসটিসি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজকের এই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে আসার পিছনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের অবদান সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য জাতীয় অধ্যাপক ডঃ নুরুল ইসলামের পরামর্শে ইউএসটিসির সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রোভিসি প্রয়াত আবদুল্লাহ আল হারুন চট্টগ্রামের মনীষীদের ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী নিয়ে গ্যালারি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ তাঁর নামে এ গ্যালারি প্রতিষ্ঠার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাকে আমি সাধুবাদ জানাই। সেই সাথে 'চির ভাস্বর চট্টল সন্তান' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি এ মহতি উদ্যোগকে মোবারকবাদ জানাই এবং এর সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

এম মোরশেদ খান এম, পি

বাণী

আবদুল্লাহ আল নোমান এম,পি
মন্ত্রী
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের গর্ব 'ইউএসটিসি' একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বন্দরনগরী চট্টলার কৃতি সন্তান মরহুম আবদুল্লাহ আল হারুন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি ইউএসটিসি-র উপ-উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

আমার জানামতে মরহুম আবদুল্লাহ আল হারুন চট্টগ্রামের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, গৌরব-উজ্জল ইতিহাস ও উন্নয়নকে ভালবাসতেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের সাহচর্যে এসে তাঁরই অনুপ্রেরণায় চট্টগ্রামের লব্ধ প্রতিষ্ঠ মনীষীদের ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন যা একটি গ্যালারি করে ইউএসটিসিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষন করার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে তিনি তা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ মরহুমের সেই মহতী উদ্যোগকে মূল্যায়ন করে ও তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়ে গ্যালারি স্থাপন ও 'চির ভাস্বর চট্টল সন্তান' নামে স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।

আমি এ মহতী উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি ও ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষের প্রতি মরহুম আবদুল্লাহ আল হারুনের ভাই হিসেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আবদুল্লাহ আল নোমান এম,পি

বাণী

মীর মোঃ নাসির উদ্দীন

প্রতিমন্ত্রী

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষাদানের মাধ্যমে ডিগ্রী প্রদান করে না, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জ্ঞান আহরণে আগ্রহী ও উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করে। জাতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ইতিহাসকে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিকড় সম্পর্কে জানার আগ্রহী করে তোলে - যা প্রতিটি দেশের সার্বিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।

আমার জানামতে ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ শিক্ষাদানের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে যে অঙ্গীকারাবদ্ধ তা চট্টগ্রামের গুণীজনদের ছবি ও জীবন-গাঁথা নিয়ে ইউএসটিসির প্রাক্তন প্রো-ভিসি (ভারপ্রাপ্ত) মরহুম আবদুল্লাহ আল হারুনের নামে গ্যালারি স্থাপন ও সেই সাথে 'চির ভাস্বর চট্টল সন্তান' নামে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে। বস্তুতঃ এ গ্যালারি হবে মরহুম আবদুল্লাহ আল হারুনের অমর কৃর্তি ও ইউএসটিসির প্রতি তাঁর অবদানের ঐতিহাসিক দলিল।

ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে এ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি গ্যালারি স্থাপন ও স্মরণিকা প্রকাশের মত মহতী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ইউএসটিসির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মোবারকবাদ জানাই।

মীর মোঃ নাছির উদ্দীন

বাণী

এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

ইউএসটিসি-র প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম একজন **শ্রদ্ধাভাজন** অনন্য ব্যক্তিত্ব। দেশ এবং সমাজের জন্য কিছু করার অদম্য আগ্রহ নিয়ে নানা বাঁধা অতিক্রম করে অবহেলিত চট্টগ্রামের বুকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি অনুসরণীয় অগ্রপথিক।

তিনি আমাদের রাজনৈতিক অগ্রজ ভাষাসৈনিক আবদুল্লাহ আল হারুনের নামে চট্টগ্রামের মনীষীদের ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে যে গ্যালারী স্থাপন ও **'চির ভাস্বর চট্টল সন্তান'** নামে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন তা তাঁর দূরদর্শী চিন্তা এবং হারুন সাহেবের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালবাসার প্রতিফল। কারণ আমরা আজ প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করার খেলায় মেতেছি। সে মুহূর্তে নতুন প্রজন্মের কাছে চট্টগ্রামের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে তুলে ধরার উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষকে মোবারকবাদ জানাই।

আমি অত্র প্রকাশনার সফলতা কামনা করছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আলহাজ্ব এবিএম মহিউদ্দীন চৌধুরী

বাণী

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য
ইউএসটিসি

ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়ে ইউএসটিসি সহস্রাধিক সদস্যের একটি বিরাট পরিবার। মাঝে মাঝে অশান্ত পরিবেশ এখানে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোন কোন সময় এ অবস্থা চরমেও উঠতে পারে। সবকিছুর পিছনে যুক্তি থাকবে এমন কথাও নয়। প্রতিষ্ঠানটি যখন নানা কারণে নানা সমস্যা নিয়ে বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন সে সময়ে উপযুক্ত, আন্তরিক, দেশপ্রেমিক, নিঃস্বার্থ, দরদী সহকর্মী হিসাবে আমি অনুরোধ মাত্র পেয়েছিলাম আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরীকে। ২৭.১০.২০০৩ তারিখ থেকে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। ছোট ভাই এর মন্ত্রীত্বের দাপট দেখাননি। সততার সাথে দুঃসাহসিকতার অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে সকল সমস্যাকে কঠোর হস্তে দমন করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করে গেলেন, দেশকে, দশকে, চট্টগ্রামকে সর্বোপরি ইউএসটিসিকে তিনি কত ভালবাসতেন।

চট্টলার বীর সন্তানদের যে তথ্য তিনি যোগাড় করেছেন তা অতুলনীয়। বস্তুতঃ অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হতে পারে, যাদের যোগসূত্র নেই তাদের তথ্যও তিনি সংগ্রহ করেছেন ঘরে ঘরে গিয়ে বহু কষ্টে যোগসূত্র বের করে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অবদান যুগে যুগে কালের স্বাক্ষী হয়ে অনন্ত কাল ধরে টিকে থাকবে। এই সংগ্রহের সাথে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

আমার প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তাঁর নামে একটি গ্যালারি স্থাপন করে তাঁর সংগৃহীত অমূল্য ঐতিহাসিক চট্টলার বীর সন্তানদের ছবি সংযোজন ও **'চির ভাস্বর চট্টল সন্তান'** স্বরণিকা প্রকাশ তাঁর কৃতিত্বের চেয়ে আমার নিকট গৌরবের, চট্টগ্রামবাসীদের জন্য একটি ঐতিহাসিক সম্পদ, দুর্লভ দলিল। যুগে যুগে এই গ্যালারি তাঁর কীর্তির অক্ষয় স্বাক্ষর হয়ে থাকবে। এর মাঝখানে তিনি বেঁচে থাকবেন।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

স্মরণ

আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী
১৯৩৩-২০০৪

স্মরণ : ইউএসটিসি'র হিতৈষী
আবদুল্লাহ আল হারুন
জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম

১৯৮৯ সালের ১৩ মে। মাত্র ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ইউএসটিসি'র যাত্রা শুরু। শুরুতে এর নাম ছিল আইএএইচএস অর্থাৎ "ইনস্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্স"। রেলওয়ে কর্তৃক দানকৃত জমির উপর স্বল্প খরচায় ক্যাপ্টেন বি. রহমানের সাহায্যে আমরা একটা টিনশেড তৈরী করি। তাও জনাব আবুল কালামের অপ্রত্যাশিতভাবে ১০ লক্ষ টাকার অনুদান পাওয়ার মাধ্যমে। তবে হিতৈষীদের মধ্যে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। অতি সামান্য আর্থিক সম্বল নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়ত তেমন সহজ হবে না। আমি এতে শঙ্কিত হইনি। আমি বলেছিলাম, আমার অভিজ্ঞতায় জানি শুরুতেই সবকিছু ছোট থাকে। আমার জীবনে যে কয়টা প্রতিষ্ঠান করার সুযোগ হয়েছে এবং পরবর্তীতে তা যে বিশাল আকার ধারণ করেছে সেগুলো শুরুতে ছিল নগণ্য, খুবই ছোট। এর মধ্যে আইপিজিএমআর অর্থাৎ পি.জি. হাসপাতাল এবং বর্তমানে বিএসএমইউ শুরু হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে খোলা জায়গায় একটা টিনশেডে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ শুরু হয় কতগুলো অস্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে। বর্তমান সেক্রেটারিয়েট স্বাধীনতার পরপর অবস্থান নিয়েছিল দশ-বারটা শেডে এবং একটা পরিত্যক্ত কলেজ বিল্ডিং-এ। এইসব ইতিহাস সফলতার সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য এ ইতিহাসগুলো শুধু সফলতার সাক্ষীই নয় বরং অনেক কিছুর সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায়।

শুরুতে সবকিছুই ছোট থাকে। বস্তুত মানব-জীবনও তাই। সৃষ্টির সেরা মানুষ জন্মগ্রহণ করে অসহায় শিশু হয়ে। পরে সে ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয় সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে প্রমাণিত হয়। এ সমস্ত উদাহরণ আমার জীবনে প্রেরণা যুগিয়েছে। ধাপে ধাপে সফলতা মনে সাহস যুগিয়েছে। আমি এগিয়ে চলেছি আইএএইচএস থেকে পরবর্তীতে ইউএসটিসি তথা বর্তমানের পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে আমার জীবনে সফলতার স্বাক্ষর চিহ্নিত করতে গিয়ে স্বীকার করতেই হবে কিছু বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমার এগিয়ে চলার পথে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন অনেকেই। প্রথম সাহায্য পাই তৎকালীন রেলওয়ের উপদেষ্টা মরহুম রিয়ার এডমিরাল সুলতান মাহমুদের কাছ থেকে। আমার অনুরোধে অতি স্বল্প সময়ে পাহাড়তলীতে তিনি বরাদ্দ দিয়েছিলেন ৩ একর জমি। এটা ছিল আমার সফলতার প্রথম সোপান। কালাম সাহেবের দশ লক্ষ টাকা এবং সুলতান সাহেবের ৩ একর জমি আমার মনে যে সাহস যুগিয়েছিল তার তুলনা হয় না। বস্তুত এর পরপরই আমি দৃঢ়তার সাথে আইএএইচএস প্রতিষ্ঠা করি, ছাত্র ভর্তি শুরু করি। এর কিছু বর্ণনা শুরুতেই দেয়া হয়েছে। ১৯৮৯ থেকে ২০০৪ সাল। এ দেড় দশকে ইউএসটিসি'র যে অগ্রগতি হয়েছে, তা ইতিমধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এর সুনাম শুধু দেশে নয়, সুদূর বিদেশেও । দেড় হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ২০০'র অধিক ছাত্র-ছাত্রী বিদেশী। নেপাল, ভারত, শ্রীলংকা, ভুটান, পাকিস্তান, ইউএই, সৌদী আরব, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ছাত্র-ছাত্রী এখানে অধ্যয়নরত। একসাথে সকল ছাত্রের সংকুলান হয় না দেখে অপেক্ষমাণ তালিকা রাখা হয়। স্বীকৃতি-স্বরূপ ব্রিটেন, আমেরিকা, শ্রীলংকা, আয়ারল্যান্ড, সর্বোপরি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে স্বীকৃতি দান করে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে প্রায় সকল বিভাগকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সুযোগ-সুবিধার মহাসমারোহে এ প্রতিষ্ঠান তুলনায় অনেক উঁচুমানের। অনেকেই প্রশ্ন করেন কেমন করে এত বিপুল পরিমাণ বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীর সমাগম সম্ভব হল। সহজে আমরা এর জবাব দিই: এখানে সেশন-জট নেই। পরীক্ষা বন্ধের তাগিদ নেই। নকলের অস্তিত্ব নেই; পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব নেই। পাঁচ বছরের কোর্স সরকারী প্রতিষ্ঠানের মত সাত বছরে গড়ায় না। বস্তুত পরীক্ষা শেষে সপ্তাহের মধ্যেই এ ফল প্রকাশের ফলে তদবির বা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকে না। একজন শিক্ষার্থীর জীবনে দুই বৎসরের মূল্য টাকা দিয়ে হিসাব করা যায় না। সেশন-জট না থাকায় সে মূল্যবান দুই বৎসর তাদের অপচয় হয় না, সঞ্চয়ের খাতায় ভরে থাকে। অতএব ভর্তি ফি বাবদ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের খরচের টাকা অনেক বেশি মনে হলেও হিসাবের দিক দিয়ে এটা লাভজনক, লোকসান নয়।

স্বীকার করতে হবে প্রতিষ্ঠানে কিছু না কিছু সমস্যা আছে। ইউএসটিসি সমস্যামুক্ত তা কল্পনায় থাকতে পারে, বাস্তবে সম্ভব নয়। বিগত সময়ে মাঝে মাঝে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর কিছু কিছু বাস্তব হলেও সব কিছু সঠিক ছিল না নিঃসন্দেহে। এর অগ্রগতিতে সকলে তাই সমানভাবে সুখী হতে পারেনি। এ'সত্য কথা এক কবিতায় পড়েছিলাম - উই আর ইঁদুরের দেখ্ ব্যবহার কাঁটিয়া ছিঁড়িয়া সব করে ছারখার, ধরাতলে নরাধম খল আছে যত, ঠিক তারা উই আর ইঁদুরের মত।

এ বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রগতির বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন মরহুম আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী। আমার পরম-প্রিয় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর। হঠাৎ করে গতবছর যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, ঠিক সে সময় আমার অনুরোধে উনি এগিয়ে না আসলে কি অবস্থার সৃষ্টি হত কল্পনা করা যায় না। প্রায় দুই বছর আগে একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসেবে তিনি আমাদের সিন্ডিকেট-সদস্য ছিলেন। প্রতিটি সভায় তিনি যোগ দিতেন, সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রো-ভিসি'র দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে ভাষাসৈনিক, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী এবং কিছুটা ব্যবসায়ী। নানা কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার ফলে তাঁর হাতে বেশি সময় থাকত না। তা সত্ত্বেও সকালে-দুপুরে এবং রাতে সময় করতে পারলেই তিনি ইউএসটিসি'তে চলে আসতেন। ইউএসটিসি'র কর্মীদের জন্য তার বাড়ির দরজা প্রায়ই খোলা থাকত৷ অফিসের যে কোন কাজে তাঁর উপদেশ কিংবা আদেশের প্রয়োজন হলে বাড়িতে গিয়ে উপদেশ নিতে পারত। আতিথেয়তায় তাঁর কার্পণ্য ছিল না। বছর দেড়েক আগে এএইচএল নামে একটি কুরিয়ার সার্ভিস চালু করেন। ইউএসটিসি'র একটি ছোটখাট অফিস তিনি এখানে চালু করেন।

উত্তপ্ত ইউএসটিসি'তে চারিদিকে যখন গোলমাল, রাজনৈতিক অঙ্গনের মানুষজন যখন লাভের আশায় উন্মুখ, এমনকি কেউ কেউ সম্পত্তি ভাগাভাগির স্বপ্ন দেখছিল, ইউএসটিসি প্রতিষ্ঠাতাকে অপসারণ করে তাঁর আসন গ্রহণের জন্য উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেছিল, সে সময় আবদুল্লাহ আল হারুনের ভূমিকা ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর চরিত্রে আমি দেখেছি একজন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক, সমাজসেবী ও নির্লোভ কর্মীর প্রতিচ্ছবি। ক্ষমতা দখল করে আসনে বসার স্বপ্ন তিনি দেখেননি। প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার দুঃসাহস নিয়ে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন। এমনকি তাঁর ছোট ভাই মন্ত্রীসভার সম্মানিত সদস্য জনাব আবদুল্লাহ আল নোমানের সাথেও তাঁর মতবিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল। শোনা যায়, নোমান সাহেবের অনুসারী নামে পরিচিত কিছু লোক ইউএসটিসি'র পরিস্থিতিকে ইন্ধন যুগিয়েছে। তাদের সম্বন্ধে কঠোর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য রাখতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। তিনি বলেছিলেন, মন্ত্রীত্বের সুযোগ আমার রাজনৈতিক জীবনে অনেকবার আসলেও আমি তা গ্রহণ করি নাই। প্রত্যাখান করার সৎ সাহস আমার ছিল। আমার প্রত্যাশা ছিল দেশকে কিছু দেবার। দেশ থেকে পাবার জন্য নয়। খোলা মনে নোমান সাহেবের সাথে তার এসব বিতর্কের কথা তিনি আমাকে বলতেন। আমি মুগ্ধ হতাম, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়তে থাকে। যখন উছৃঙ্খল ছাত্রের স্বঘোষিত নেতা বলে পরিচিত একজন তাঁর সম্বন্ধে এক অশালীন বক্তব্য রেখেছিল, এমনকি একদিন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল, এমন একটি পরিস্থিতিতেও তাঁর দেখেছি শান্ত সহনশীল রূপ। সামান্য ইঙ্গিত দিলে হয়ত উক্ত ব্যক্তির উপর আঘাত হানতে পারতেন, কিন্ত তিনি তা করেন নাই। বরং তাঁর আচরণকে সহনশীলতার সাথে গ্রহণ করেছেন। শুধু দু-একবার ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে শুনেছি, 'ওই ছেলেটি যে অপরাধ করেছে তা আপনি ভিসি হিসেবে মাফ করতে পারেন, আমি কোন দিন করব না। আপনার এবং আমাদের সাথে তার যে আচরণ তা আমি ভুলতে পারি না'। ' রাগের মাথায় এসব বলে ফেললেও তাঁর যে আচরণ তা আমি ভূলতে পারব না'। রাগের মাথায় এসব বলে ফেললেও তাঁর হৃদয়ের কোমলতা উপলব্ধি করেছি বার বার। মুখে যতই বলুন না কেন তাঁর অন্তর ছিল কোমল। তিনি ছিলেন স্নেহপরায়ণ। সেই সুযোগে নানা আপত্তিকর আচরণ করেও অনেকে রেহাই পেয়ে যেতেন। তাই অপরাধী হয়েও অনেকেই মুক্ত থাকতে পেরেছে। অথচ, মেঝভাই মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি কোন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেননি। বরং অহেতুক সুবিধা আদায়কে তিনি ঘৃণা করতেন। রাজনৈতিক ফায়দা লুটে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার ঘটনা বাংলাদেশে বিরল নয়। বহু বছর ধরে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিচরণ করেও তিনি অবস্থার পরিবর্তন করাননি। সে কারণে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। পরিচ্ছন্ন সমাজকর্মী হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, পত্র-পত্রিকায়, সভা-সেমিনারে যেভাবে তাঁকে মূল্যায়িত করা হয়েছে তা হতে প্রতীয়মান হয় আবদুল্লাহ আল হারুন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু ইউএসটিসি নয়, সমাজ তথা দেশ একজন বড়মাপের মানুষকে হারালো। ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ পেলে আশা রইলো আরো বিস্তৃত করে তাঁকে নিয়ে লেখার। কামনা করি মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

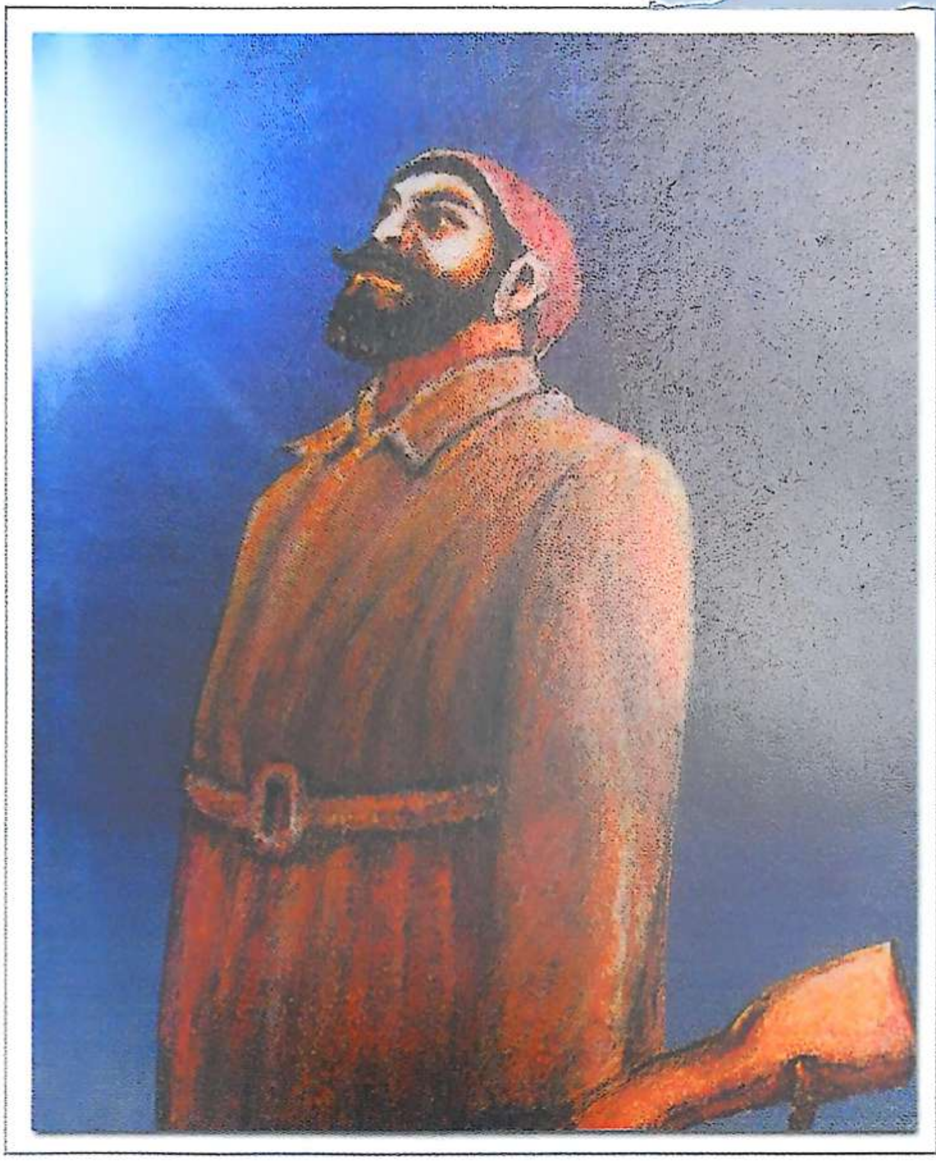

হাবিলদার রজব আলী খাঁ

রজব আলী খাঁ চট্টগ্রাম মিলিটারী ব্যারাকের ৩৪ নম্বর রেজিমেন্টের হাবিলদার। চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহী। ১৮৫৭ সালের ২৩ নভেম্বর ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান উড়ান। চট্টগ্রামে বসবাসকারী ইংরেজরা তাঁর ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

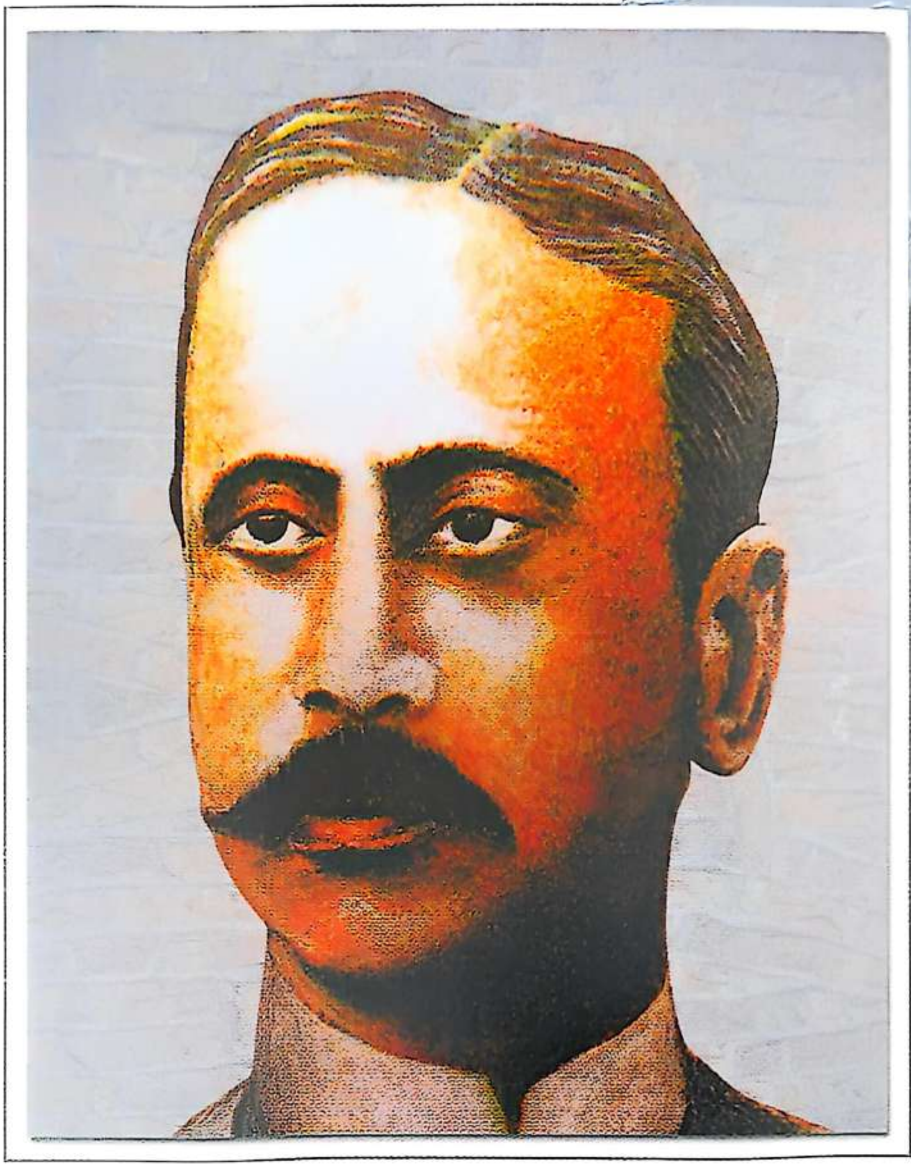

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

রাউজান থানার নয়াপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা: গোপীমোহন সেন, মাতা: রাজরাজেশ্বরী। বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে ছিলেন। তিনি অনেক কাব্য রচনা করেন। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য লিখে তিনি রাজরোষে পড়েন।

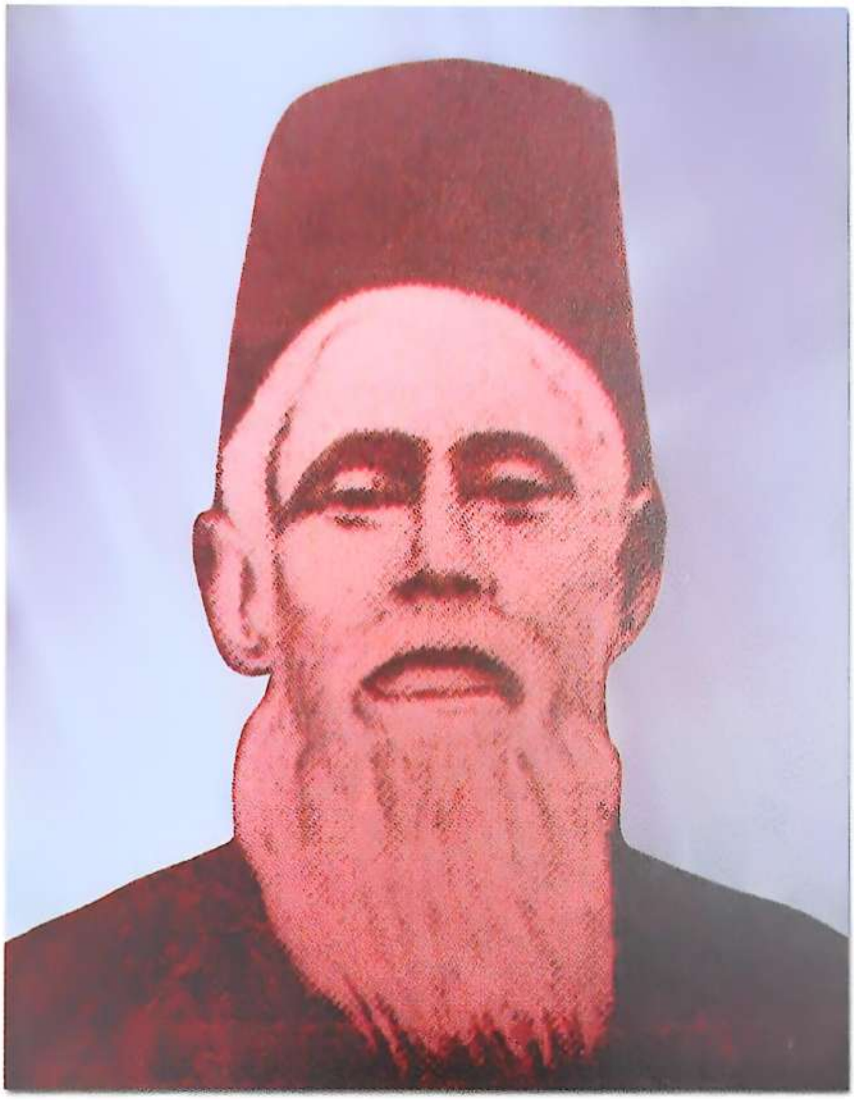

কাজেম আলী মিঞা (১৮৫২-১৯২৬)

চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় জন্ম। লেখাপড়া কলকাতায়। সেখান থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। কাজেম আলী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। সরকার প্রদত্ত 'খান বাহাদুর' উপাধি প্রত্যাখ্যান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সংগঠক। ১৯১৩ সাল থেকে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির আজীবন কমিশনার। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে নানা আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও কারাবরণ। অসাধারণ বাগ্মী।

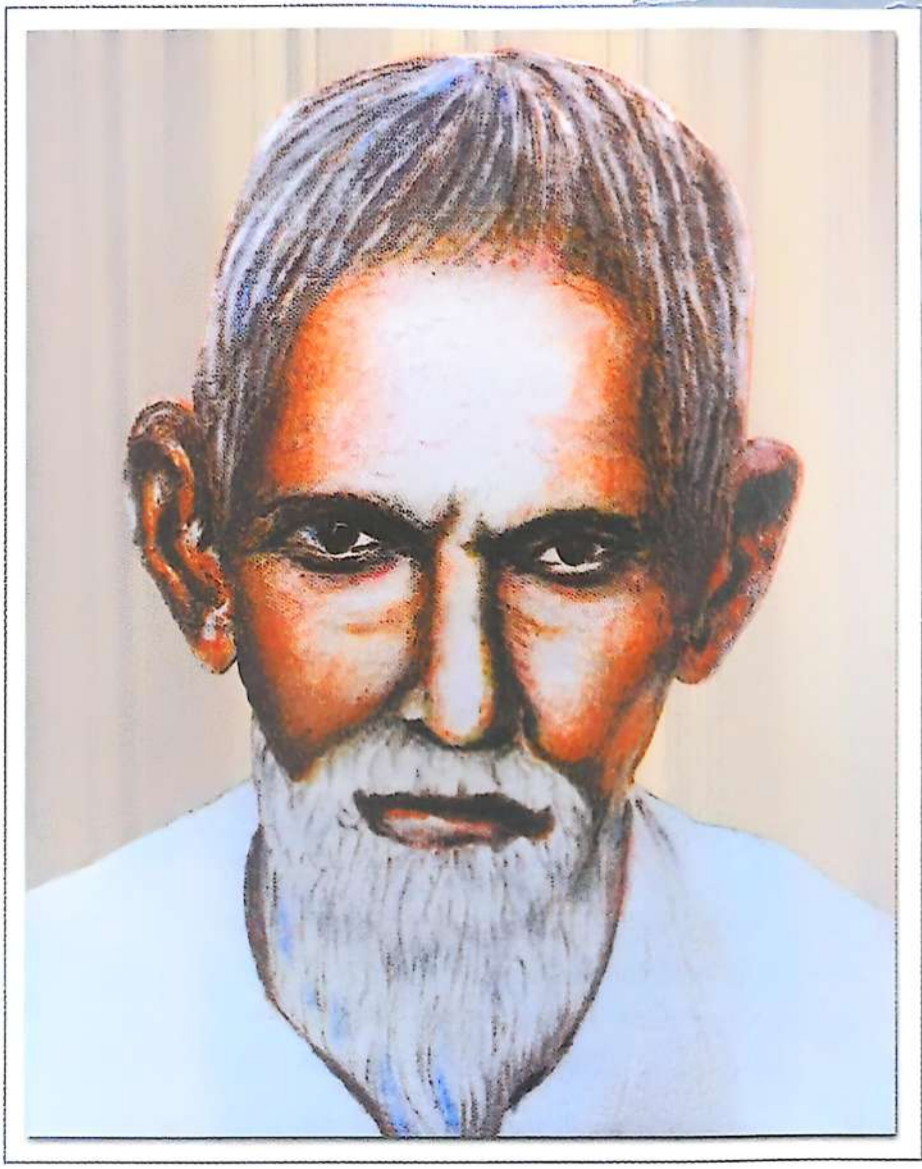

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩)

পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্ম। পিতা: মুন্সি নূরউদ্দিন, মাতা: মিসরীজান। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা ও পরে সাব জজ আদালতের কেরানি। চাকুরি জীবনের পাশাপাশি সাহিত্য-সাধনা। মধ্যযুগের কবিদের পুঁথির সংগ্রাহক। বাঙলা ভাষা আন্দোলনের আদি পথিকৃৎ।

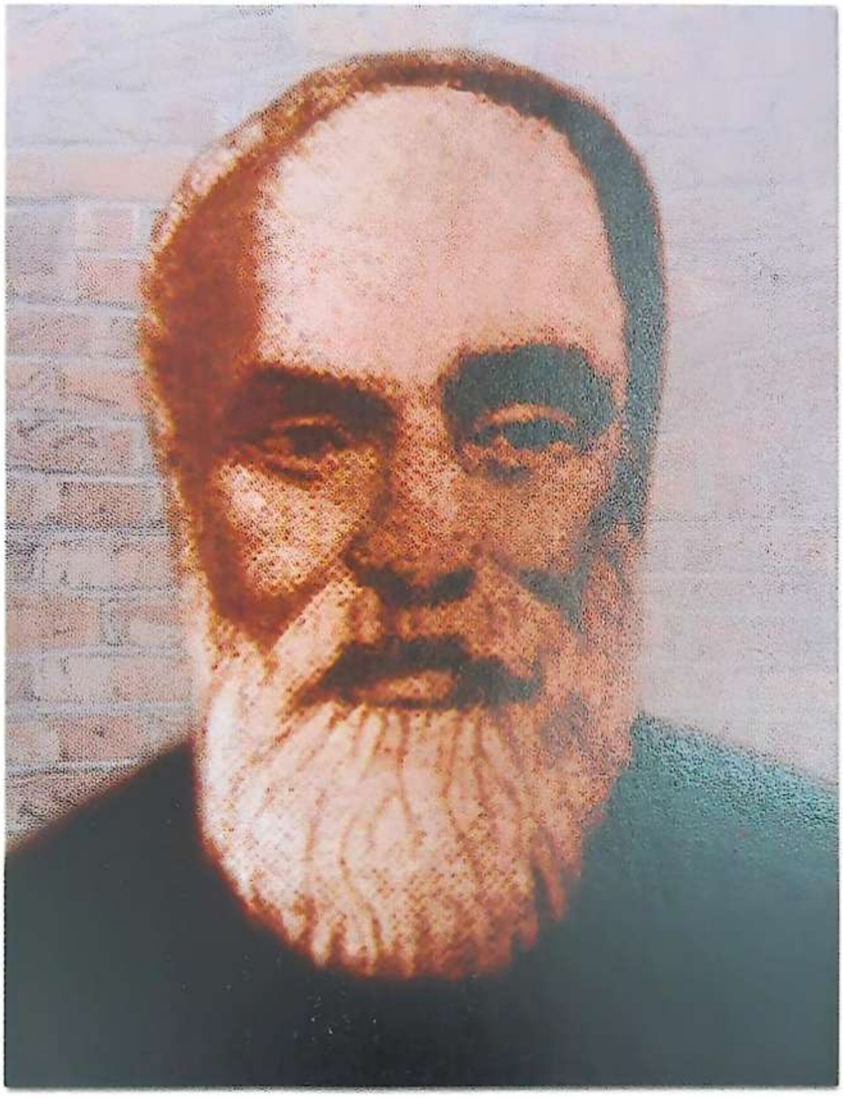

মহিমচন্দ্র দাশ (১৮৭১-১৯৪০)

পটিয়া থানার ভাটিখাইন গ্রামে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৮৯৭ সালের আইন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ। ১৯১০ সাল থেকে চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি। সূর্য সেনকে তিনি চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সম্পাদক মনোনীত করেন। 'পাঞ্চজন্য'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 'জাতির নামে বজ্জাতি' গ্রন্থের রচয়িতা। জেল বরণ ৮ বার।

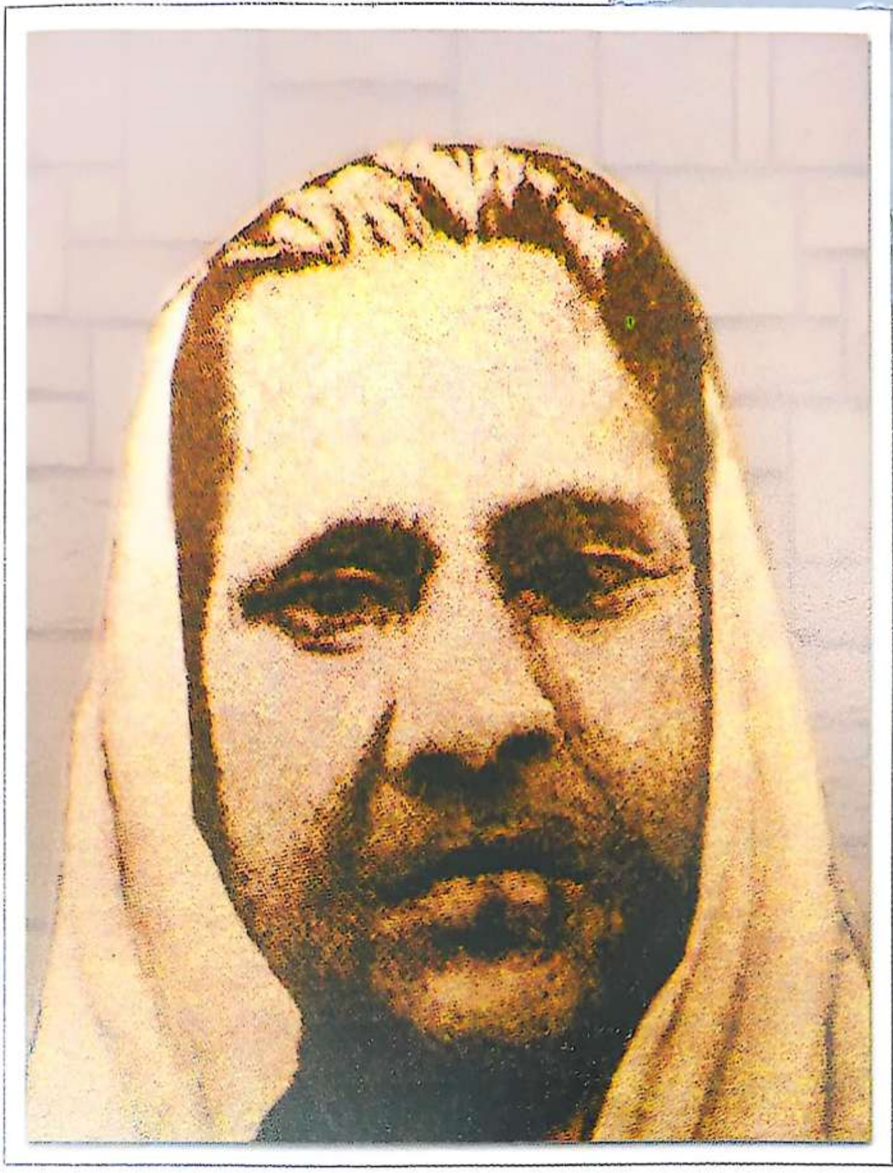

সাবিত্রী দেবী (১৮৭১-১৯৪০)

জন্ম পটিয়া থানার মটপাড়ায়। বিবাহ ধলঘাট গ্রামে। স্বামী বীরেশ্বর চক্রবর্তী। মেয়ে স্নেহলতা ও পুত্র রামকৃষ্ণকে নিয়ে বিধবা। বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রী। তাঁর বাড়িটি ছিল বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটি। তাঁর বাড়িতেই ১৯৩২ সালের ঐতিহাসিক ধলঘাট যুদ্ধ হয়।

সূর্য সেন ও নির্মল সেন যখন প্রীতিলতার সাথে কথা বলছিলেন, তখনই ক্যাপটেন ক্যামরুন বাড়িটি ঘিরে ফেলে। ভয়াবহ যুদ্ধে ক্যামরুন নিহত, নির্মল সেন শহীদ হন। বিপ্লবীদের আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে কিশোর পুত্র রামকৃষ্ণ সহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিশোর রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর জীবনাবসান ব্রিটিশের কারাগারে। তিনি নিজেও কারা নির্যাতন ভোগ করেন চার বৎসর।

আবদুল হক দোভাষ (১৮৭৪-১৯৫০)

দোভাষ পরিবারের এক কিংবদন্তী খান বাহাদুর আবদুল হক দোভাষ। তিনি আবদুল হাকিম দোভাষের পুত্র। তার মা'র নাম আলীমুন্নিছা বেগম। আবদুল হক দোভাষের জন্ম ১৮৭৪ সালের অক্টোবর মাসে। তৎকালীন সময়ে স্থানীয় মুসলমান সমাজে লেখাপড়ার প্রসার খুব একটা ছিল না বিধায় তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী এবং শিক্ষানুরাগী। স্বচ্ছ বুদ্ধি, উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং দুরদর্শিতায় তিনি বলিষ্ঠ নৈতিক চরিত্রের ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন।

অন্যদিকে বৃটিশরাজ ও তাঁর মুন্সীয়ানায় পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁকে খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে, অপরদিকে ১৯৩০ সালে মাষ্টারদার নেতৃত্বে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং তাদের বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। আবদুল হক দোভাষের বাড়িতে গড়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা। '৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কমিউনিষ্টরা তখন তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের রোষানলে। এ ধরনের এক নাজুক পরিস্থিতিতে জনসাধারণ কমিউনিষ্টদের এড়িয়ে চলতো। দেশপ্রেমিক বিল্পবী অনন্ত সিং তখন কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে যুক্ত। চট্টগ্রাম কারাগার থেকে মুক্তির সময় ভয়ে কেউ তাঁকে স্বাগত জানাতে যায়নি। কিন্তু খান বাহাদুর আবদুল হক দোভাষ সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে চট্টগ্রামের-গৌরব বিপ্লবী অনন্ত সিংকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। গুণী ও কৃতী মানুষের প্রতি আগ্রহ ছিল অপরিসীম। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম চট্টগ্রামে এসে আবদুল হক দোভাষের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন। নদীর ওপারে আবদুল হক দোভাষের ভাঙার চরের খামার বাড়িতে বাস করে নজরুল লিখেছিলেন 'কর্ণফুলী' কবিতা। আবদুল হক দোভাষ আরো একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেছেন। চট্টগ্রামের কৃতী মণীষা মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী কংগ্রেস করতেন। ভারত বিভাগের পর তদানীন্তন পাকিস্তানে তাঁর উপর নিগ্রহ শুরু হয়। তখন আবদুল হক মওলানার পাশে দাড়িয়েছিলেন। যুব বিদ্রোহের বিপ্লবী অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, কল্পনা দত্ত, টগর প্রমুখদেরকেও তিনি আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। এভাবেই তিনি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজের অবদান রেখেছিলেন। শেরে বাংলা এ, কে, এম, ফজলুল হক বিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী হয়ে চট্টগ্রামে এলে তাঁকে তিনি বিপুল ভাবে সংবর্ধিত করেন। মানুষের কল্যাণে এবং তাদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁর চরিত্রের প্রধান দিক। দুঃস্থ মানুষের সেবায় তিনি যখনই ডাক এসেছে ছুটে গেছেন। সেবামূলক বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত অর্থ জুগিয়েছেন। দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন সময়ে ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে তিনি চন্দ্রঘোনায় দুঃস্থ মানুষের পাশে দাড়িয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। আধুনিক শিক্ষাও স্ত্রী শিক্ষার জন্যও তিনি আগ্রহী ছিলেন। তিনি বহু শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অর্থ জুগিয়েছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও পোর্ট ছিলেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের ট্রেজারার ছিলেন। তিনি আমৃত্যু নগর মুসলিম লীগের সভাপতি এবং একই সঙ্গে স্থানীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৫০ সালের ২২ অক্টোবর দিল্লীর নিজামউদ্দীনের দরগায় মৃতুবরণ করেন। সেখান থেকে তার মরদেহ এনে চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বাজার মসজিদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

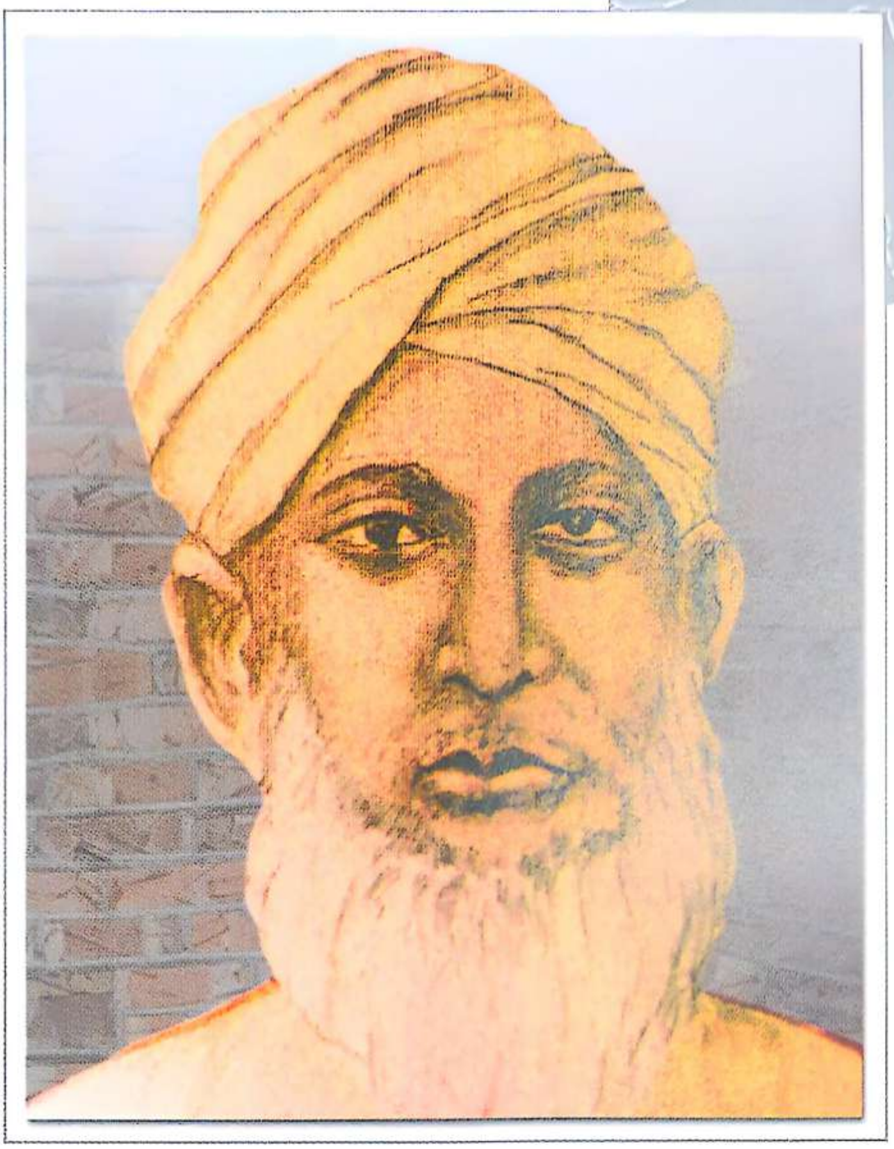

মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)

মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সাহেবের জন্ম বরমা-আড়ালিয়া গ্রামদ্বয়ের সীমান্তে গড়ে ওঠা এক বনেদী পরিবারে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের পর রংপুরের একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় যোগ দেন। একই সঙ্গে 'সোলতান' নামের একটি সাপ্তাহিক বের করেন। কিছুকাল পর সীতাকুণ্ড মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। এই সময় মিসরের 'আল মিনার, আল এহরাম', 'আল বিলাদ' পত্রিকায় আরবী ভাষায় তাঁর লেখা বের হত।

তাঁর বিখ্যাত 'সোলতান' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা' 'ইসলাম মিশন', 'খাদেমুল ইনসান সমিতি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপনসহ সমাজ সেবামূলক কাজে জড়িয়ে পড়েন। তিনি দৈনিক হাবুলুল মতিনে'র বাংলা সংস্করণ সম্পাদনা করেন। তিনি চট্টগ্রাম থেকে 'ইসলামাবাদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও বের করতেন। উল্লেখ্য সাপ্তাহিক 'সোলতান' ও মাসিক 'আল ইসলাম' তাঁর কৃতিত্বের সেরা স্বাক্ষর। কদম মোবারক এতিমখানা তাঁরই গড়া প্রতিষ্ঠান।

দেয়াঙ্গের পাহাড়ে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান করা তাঁর বড় স্বপ্ন ছিল। এর বাস্তব রূপরেখাও তিনি রচনা করে গেছেন। তিনি ১৯৩৭ সালে চট্টগ্রাম দক্ষিণ মহকুমা থেকে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ইসলামাবাদী সাহেব ভারতের মুসলমান সভ্যতা ও আত্মজীবনীসহ ২২টি গ্রন্থের লেখক। তাঁর প্রায় সব গ্রন্থই গবেষণামূলক।

এ খ্যাতনামা সাংবাদিক, গবেষক-লেখক, রাজনীতিবিদ, সংগঠক শেষ বয়সে ইংরেজদের রোষানল থেকে রেহাই পাননি। ফলে ৬৫ বছর বয়সে তিনি ভারতের বিখ্যাত নেতা মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে দিল্লীর লালকেল্লায় বন্দী হন। কিন্তু বহু নির্যাতন করেও কোন তথ্য বের করতে না পেরে তাঁদের মুক্তি দেয়। এভাবে জাতির মঙ্গলের জন্য নানা বিষয়ে কঠোর শ্রম, জেল- জুলুম ভোগ সর্বোপরি অসংখ্য প্রবন্ধ ও ২২টি গ্রন্থ এ মহামনীষী উপহার দিয়ে গেছেন।

কদম মোবারক শাহী মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত চট্টগ্রাম শহরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এতিমখানার স্বত্ব তৎকালীন সম্পাদক তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী জনাব নজির উদ্দীন সাহেবের নামে দলিল মূলে হস্তান্তর করে যান। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে অক্টোবর এই মহামনীষীর ইন্তেকাল হয়।

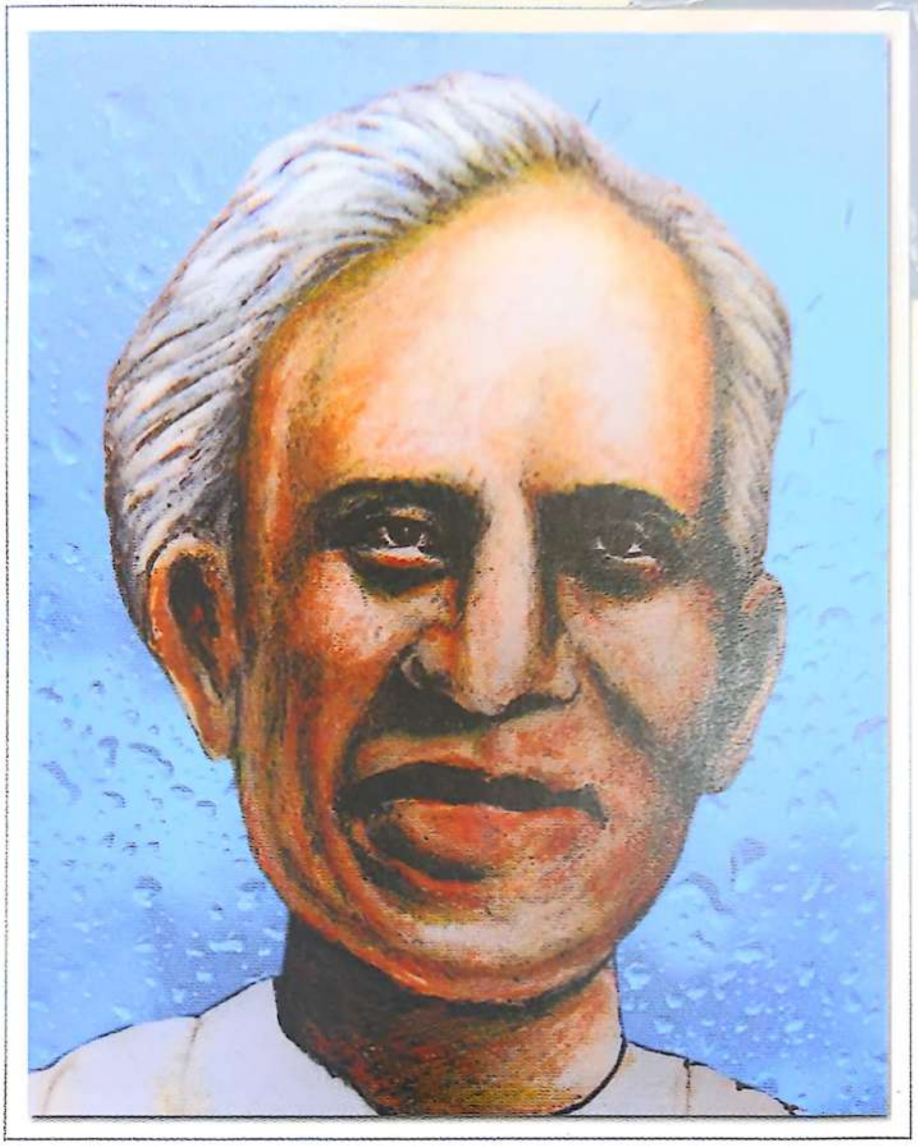

গণকবিয়াল রমেশ চন্দ্র শীল (১৮৭৭-১৯৬৭)

বোয়ালখালী থানার গোমদণ্ডী গ্রামে জন্ম। পিতা: চন্ডীচরণ শীল, মাতা: রাজকুমারী। ১১ বছর বয়সে বার্মা গমন, প্রত্যাবর্তন ১৮ বছর বয়সে। ২১ বছর বয়সে হঠাৎ কবিগায়ক হওয়া। গ্রাম-গঞ্জের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের মধ্যে মিশে তাদের কষ্ট উপলব্ধি। তা থেকেই বিদ্রোহ।

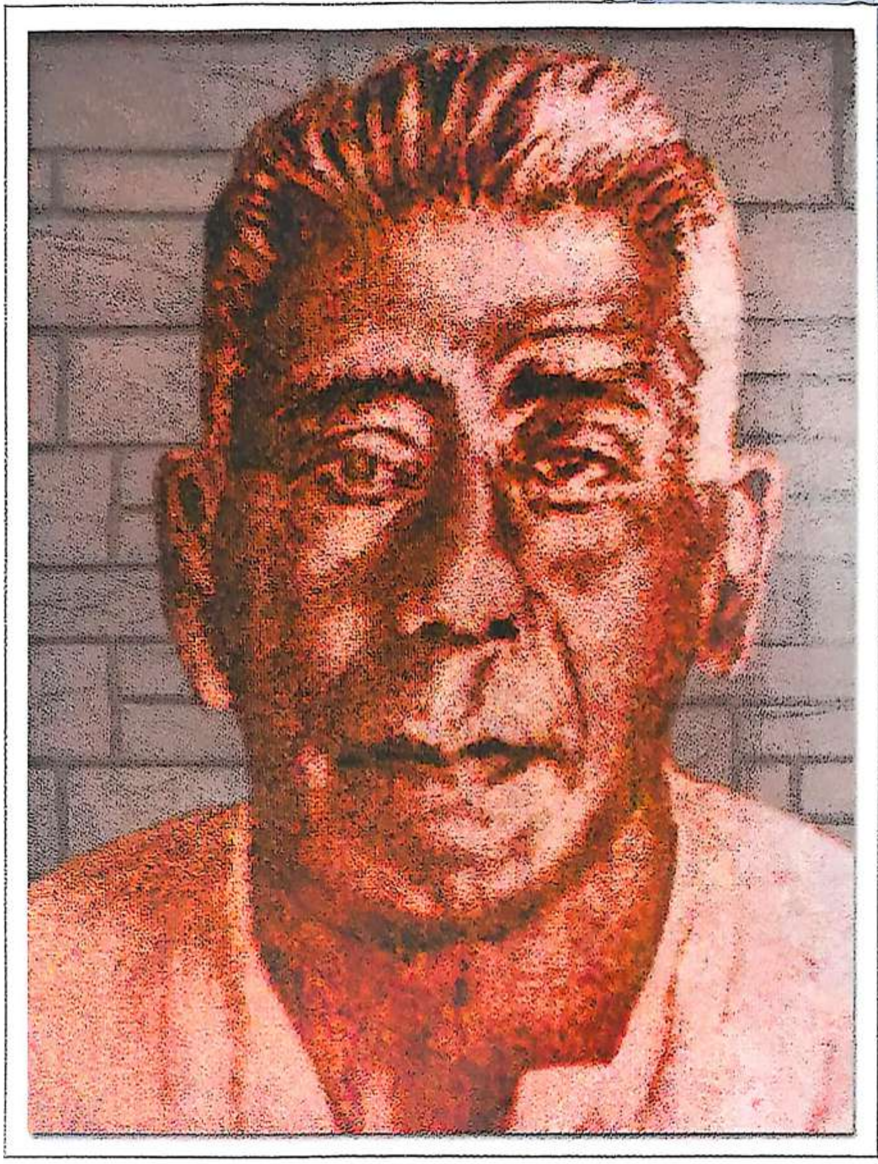

চারু বিকাশ দত্ত (১৮৭৮-১৯৩৬)

পিতা সুখেন্দু বিকাশ দত্ত, মাতা শৈলজাবালা দত্ত। বোয়ালখালী থানার কানুনগো পাড়ায় জন্ম। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ পাশ করেন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই রাজনীতিতে যুক্ত।

১৯১৯ সালে চট্টগ্রামে বিপ্লবীদল গঠনে পঞ্চপাণ্ডবের একজন। মাস্টারদা সূর্যসেনের সশস্ত্র বিদ্রোহে বিরোধিতা করে অনুশীলনদলে প্রত্যাবর্তন। চট্টগ্রাম অনুশীলন দলের অন্যতম নেতা। ১২ বৎসর কারাবাস।

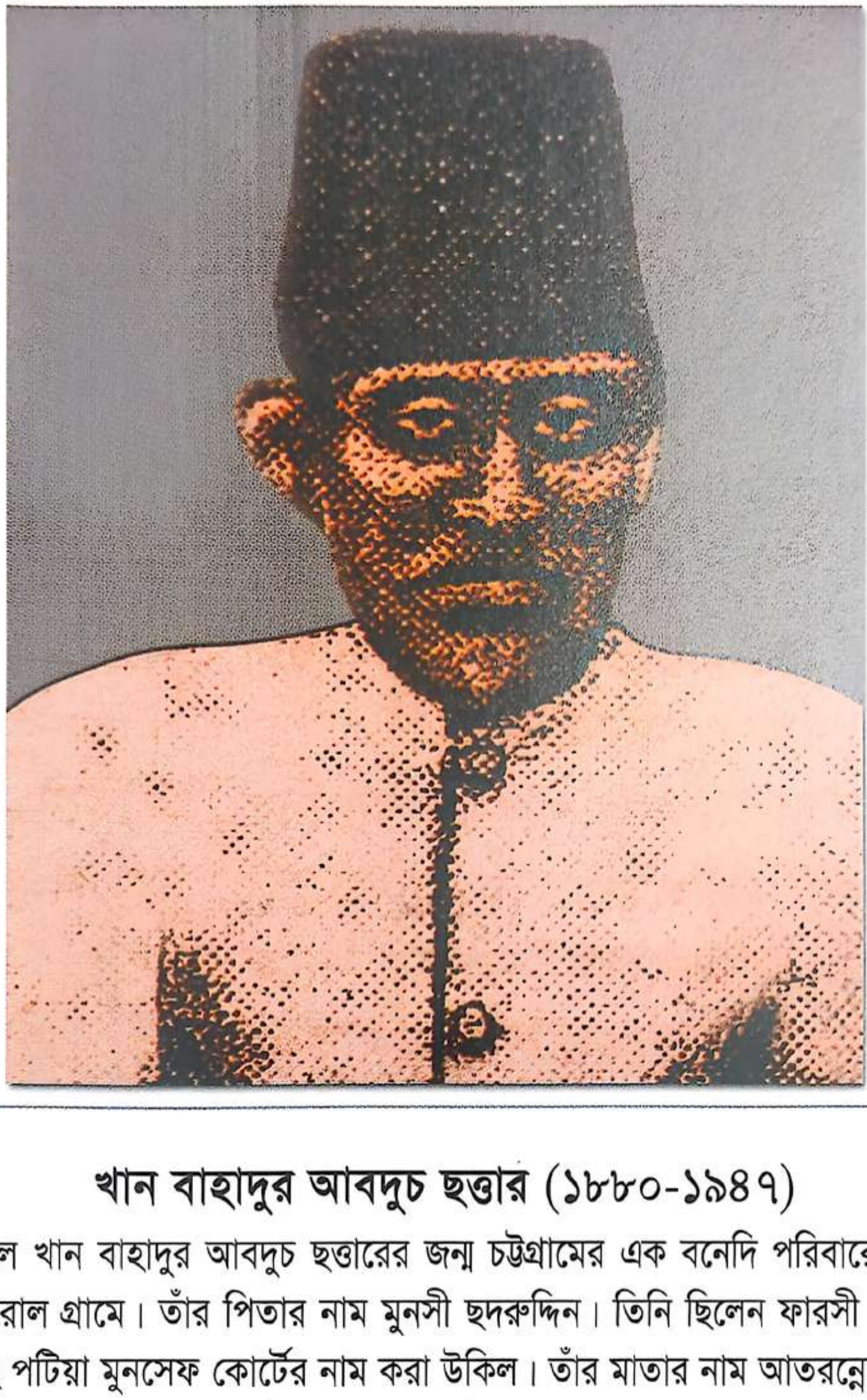

খান বাহাদুর আবদুচ ছত্তার (১৮৮০-১৯৪৭)

১৮৮০ সালে খান বাহাদুর আবদুচ ছত্তারের জন্ম চট্টগ্রামের এক বনেদি পরিবারে, আনোয়ারা থানার ভিংরোল গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মুনসী ছদরুদ্দিন। তিনি ছিলেন ফারসী ভাষায় বিদগ্ধ পন্ডিত এবং পটিয়া মুনসেফ কোর্টের নাম করা উকিল। তাঁর মাতার নাম আতরন্নেছা।

খান বাহাদুর আবদুচ ছাত্তার কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রাস পাশ করেন ১৮৯৮ সালে এবং বি.এ. বি.এল পাশ করেন ১৯০২ সালে ডিষ্টিংশন নিয়ে। ফলে সেই বছরেই তিনি চট্টগ্রাম জজকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন সেই সময়ে জর্জকোটের একজন প্রথম উচ্চ শিক্ষিত উকিল। ইতিপূর্বে যাঁরা জজকোর্টে ওকালতি করতেন তাঁরা সকলেই ছিলেন পি, এল অর্থাৎ সরকারের অনুমতিপ্রাপ্ত (লাইসেন্সড) প্র্যাকটিশনার।

খান বাহাদুর আবদুচ ছাত্তার জ্ঞান ও বাগ্মীতার কারণে ১৯০৪ সালে সরকারি উকিল নিযুক্ত হন এবং সেই বছরই সমবায় আইন পাশ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ দেশের গরীব জেলে, তাঁতী, ছোট ছোট ব্যবসায়ীর সাথে সমবায় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯০৫ সালে 'দ্য চট্টগ্রাম আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । এছাড়া সংখ্যাগুরু মুসলমান খাতকদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত অসাম্প্রদায়িক ও কংগ্রেস নেতা মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর আন্তরিক সহায়তায় ১৯০৯ সালে 'ইসলামাবাদ টাউন কো- অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১২ সালে তিনি নিজ গ্রাম ভিংরোল আনোয়ারা গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠা করে গরিবী হঠাও আন্দোলন সফল করে তোলেন। তাঁর অমরকীর্তি শতাব্দীর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিপণন কেন্দ্র 'ধর্মগোলা' আজও ছাত্তার হাটে ছয়খানা দোকান সহ আর্ত মানবতার সেবায় অনির্বাণ হয়ে রয়েছে। অথচ তাঁরও ৬ বছর পরে তৃতীয় বিশ্বের ভারত উপমহাদেশে ১৯১৫ সাল থেকে নিবন্ধনকৃত ব্যাংক চালু হয় বোম্বে নগরীতে। ১৯১৯ সালে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইনের আওতায় চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান খান বাহাদুর আবদুচ ছাত্তার ১৯২০ সালে চট্টগ্রামে 'চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক' স্থাপন করে সমবায় আন্দোলনে আরো গতি সৃষ্টি করেন। এ নামকরণের একমাত্র দিকপাল ছিলেন খান বাহাদুর আবদুচ ছাত্তার। ১৯২২ সালে খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তিনি স্থাপন করেন 'চট্টগ্রাম ট্রেডার্স কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ'। এটি প্রতিষ্ঠায় খান বাহাদুর ছাত্তার সাহেব কে সহযোগিতা করেন তাঁর উত্তরসূরী চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালটির দ্বিতীয় চেয়ারম্যান নূর আহম্মদ, পি কে সেন, হাজী নজুমিয়া সওদাগর প্রমুখ। খান বাহাদুর আবদুচ ছাত্তার ১৯২৮ সালে রেঙ্গুণ প্রবাসী আবদুল বারী চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'বেঙ্গল বার্মা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন। যা পরবর্তীতে বোম্বাইয়ের ' সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোঃ লিঃ এর সাথে একত্রীভূত হয়। ১৯৩২ সালে চট্টগ্রামকে শিল্পে স্বনির্ভর করার জন্য প্রথম চট্টগ্রাম বন্দর সংলগ্ন কর্ণফুলী নদীর তীরে ' ন্যাশনাল কটন মিল' প্রতিষ্ঠায় কে, কে সেনকে সার্বিকভাবে সহায়তা দান করেন খান বাহাদুর আবদুচ ছাত্তার। খান বাহাদুর আবদুচ ছাত্তার ১৯২০ সাল সময়ের মধ্যে পাক্ষিক ' ইসলামাবাদ' (ইসলামাবাদ মানে চট্টগ্রাম) এবং নিলাম ইস্তেহার সমৃদ্ধ সাপ্তাহিক ' সুনীতি' পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু ১৯২২ সালে তিনি বোম্বাই কংগ্রেসের সম্মেলনে যোগদান করার ফলে 'সুনীতি' পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সাময়িক ভাবে সরকারি খেতাব 'খান বাহাদুর' বাতিল করা হয়। ১৯৩১ সালে তিনি আর একটি ব্যাংক করেন-'ছত্তার ব্যাংক নামে। খান বাহাদুর আবদুচ ছাত্তার ১৯৩৫ সালে মুসলিম লীগের সাথে সম্পৃত্ত হন। ১৯৬৫ সাল থেকে ২৮ শে অক্টোবর ১৯৪৭ সালে পরলোকগত হবার দিন পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্ব অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তাঁকে আমানত শাহ্ মাজারে সমাহিত করা হয়।

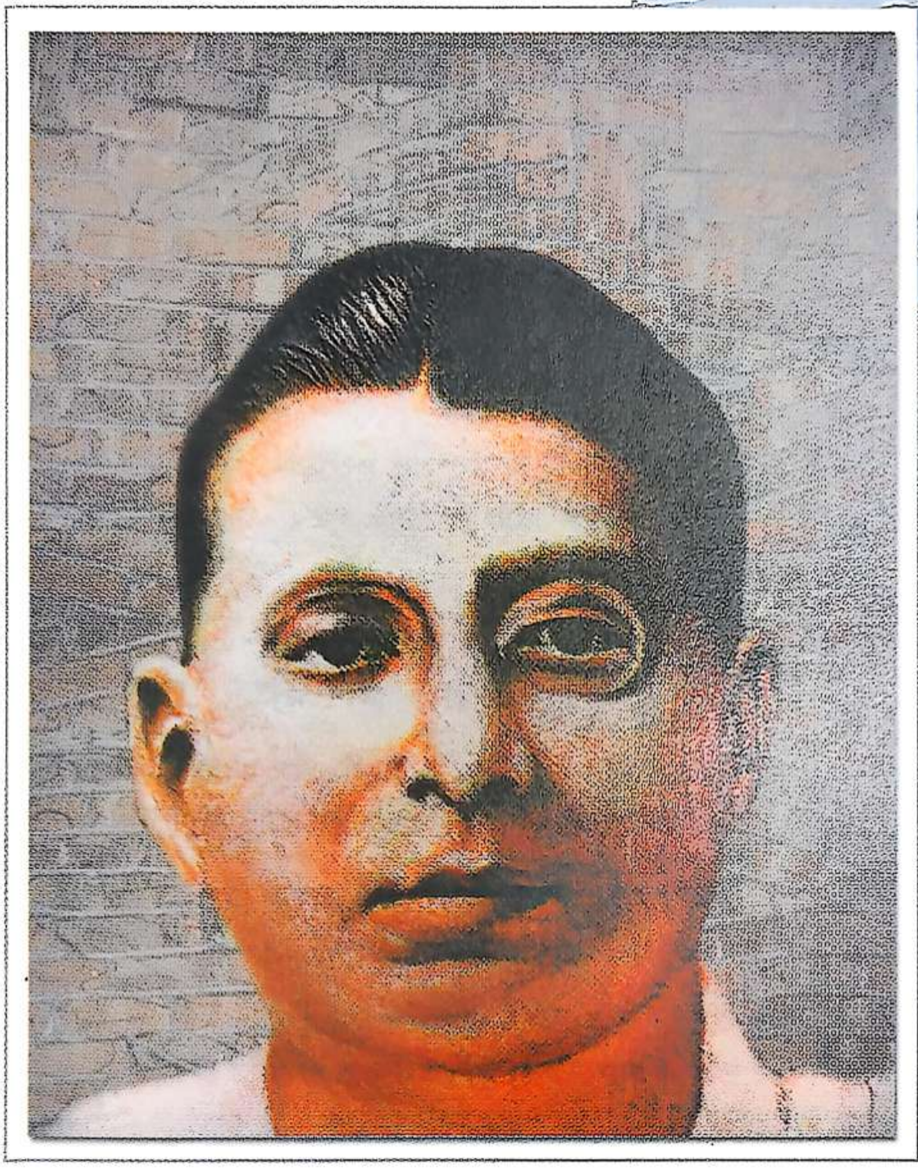

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩)

চন্দনাইশ থানার বরমা গ্রামে জন্ম। পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত, মাতা বিনোদিনী সেনগুপ্ত। ১৯০৪ সালে উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত যাত্রা। ব্যারিস্টারী পাশ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতা।

খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৬২)

তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ও লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর নির্ভিক মেম্বার, চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান, আমীরুল হজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী জন্মেছিলেন বাঁশখালী উপজেলার বৈলছড়ি উজির বাড়ীর এক বনিয়াদী বংশে, ১৮৮৬ সনের ২৩শে মার্চ। দীর্ঘ ৭৭ বছরের সংগ্রামী জীবন লাভ করেছিলেন তিনি। তাঁর ত্রয়োদশ পূর্বপুরুষ হযরত ছৈয়দ আবদুর রহমান সিদ্দিকী (রঃ) ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পবিত্র আরবভূমি থেকে বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তারই এক অধঃস্তন পুরুষ মোহাম্মদ খান চট্টগ্রাম লোহাগাড়ার মল্লিক ছোয়াং-এ এসে বসতি গাড়েন। তিনি নবাব শায়েস্তা খাঁর উজির ছিলেন বলে প্রকাশ। বৈলছড়ি উজির বাড়ী তারই কিছুটা ইঙ্গিত বহন করে। খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী হচ্ছেন তারই অধঃস্তন পুরুষ।

খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী ভারতীয় অবিভক্ত বাংলার আইন সভার সদস্য (এম.এল. সি) ছিলেন ১৯২৯ সন থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত। চট্টগ্রামের টেকনাফ থেকে রাঙ্গুনিয়া পর্যন্ত ১৩ থানা ছিল তার নির্বাচনী এলাকা। আর ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সনে চট্টগ্রাম বিভাগের ৫ জেলা থেকে তিনি জমিদারগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন অবিভক্ত বাংলার আইন সভার সদস্য (এম. এল. এ) । তার নির্বাচনী এরিয়া ছিল বৃহত্তর চট্টগ্রাম, বৃহত্তর নোয়াখালী, বৃহত্তর ত্রিপুরা, বর্তমান কুমিল্লা ও বৃহত্তর সিলেট। তিনি একাধারে ৩০ বছর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ১৯২২ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। তিনি চট্টগ্রাম পৌরসভার কমিশনার ছিলেন ২ টার্মে ৯ বছর। এছাড়া তিনি ক্যালকাটা পোর্ট হজ্ব কমিটি, ইন্ডিয়া রোড বোর্ড কমিটি, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে এডভাইজারী কমিটি, বেঙ্গল এক্সাইজ স্ট্যান্ডিং কমিটি, বেঙ্গল মেডিকেল স্ট্যান্ডিং কমিটি, বেঙ্গল ইরিগেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি, বেঙ্গল রেভিনিউ স্ট্যান্ডিং কমিটি, বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল বোর্ড, জেনারেল হসপিটাল এন্ড মেডিকেল স্কুল, চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, চট্টগ্রাম স্কুল বোর্ড, চট্টগ্রাম ইন্ডাষ্ট্রি বোর্ড এর সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি দেশপ্রিয় সুগার মিল-কলিকাতা, কো-অপারেটিভ ট্রেডার্স ব্যাংক, ইন্দো-বার্মা ট্রেডার্স ব্যাংক, মহালক্ষ্মী ব্যাংক, ইউনাইটেড কমন ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর ডাইরেক্টর ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ছিলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, পটিয়া টি কোম্পানী-কলিকাতা, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন-কলিকাতা, সেক্রেটারী, চট্টগ্রাম বিভাগীয় জমিদার এসোসিয়েশন, সেক্রেটারী, এন্টি-ম্যালেরিয়াল সোসাইটি-চট্টগ্রাম। দেশ ও জনদরদী পার্লামেন্টারিয়ান তার সংসদীয় জীবনে এমন কোন বিষয় বাকী রাখেননি যা না তিনি সংসদে উত্থাপন করে তার অনুকূলে বক্তব্য রেখেছেন।

১৯৪৪ সনের ৭ই জুনে সংসদ কক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে দুর্ভিক্ষ কবলিত চট্টগ্রামের জন্য তার জীবন বাজী রেখে সে সময়ের ৮ লক্ষ টন চাউল আদায়ের ঘটনা ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সেদিন সংসদ কক্ষে দাঁড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, আমি চট্টগ্রামের লোক। আমার দেশের লোক অনাহারে মারা যাইবে, অথচ মেম্বারী গদী রক্ষার জন্য এই (অন্যায়) আদেশ রক্ষা করিয়া (এসেম্বলী হলের) বাহির হইব ইহা আমার পক্ষে কখনো হইবে না ও হইতে পারিবেও না। আমার তিন কথা। যথা- ১. হয় চট্টগ্রাম বিভাগে চাউল দিতে হইবে, নতুবা ২. আমাকে এখানে মারিয়া ফেলিতে হইবে, অথবা ৩. আমি এখানে কাহাকেও কোন কাজ করিতে দিব না। আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত, শেষ রক্তবিন্দু শরীরে থাকা পর্যন্ত আমি বাহির হইব না। আমার দেশের দুঃখ কষ্টের কথা আমি বলিবই বলিব। (এসেম্বলী প্রসিডিংস, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলী,ভল্যুম ৬৭, নং ৬, পৃষ্ঠা ২২১-২২২)। উল্লেখ্য, সে সময় অবিভক্ত বাংলার খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। চট্টগ্রাম বিভাগে শিক্ষাকর রহিত করার জন্যে তিনি এসেম্বলীতে আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তিনি চট্টগ্রামে তখন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার আইন পাশের সহায়তা করেন। তার চেষ্টাতেই প্রথম চট্টগ্রামে প্রাইমারী শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হয়। মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালের সদস্য থাকাকালীন তিনি ছাত্র আসন সংখ্যা ও বৃত্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেন। প্রাইভেট মেডিকেল স্কুলে পাস করা ছাত্রদের চাকুরীর জন্য তার প্রশংসনীয় পদক্ষেপের কারণে তিনি এতদ্বসংশ্লিষ্ট প্রিভিলেজ কমিটিতে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সংসদের প্রসিডিংস বই-এ এইসব উজ্জ্বলভাবে উল্লেখিত আছে। বৈলছড়ি নজমুন্নেছা হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। ১৯৩৫ সনে হজুব্রত পালনকারী অবিভক্ত বাংলার হাজীগণের নেতৃত্বদানের জন্য তিনি 'আমীরুল হজ্ব' উপাধি প্রাপ্ত হন। সর্বোপরি, জনসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৩৬ সনে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তিনি 'খান বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৬২ ইংরেজী সনের ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার জুমার জামায়াতে শেষ নামাজ আদায় করে সেদিন বিকেলে চিরকালের জন্য তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন। আমিন।

ড. বেণীমাধব বড়ুয়া (১৮৮৮-১৯৪৮)

চট্টগ্রামে রাউজান থানায় মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামের একটি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেণীমাধব ১৮৮৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের মডেল স্কুল থেকে চৌদ্দ বছর বয়সে এম ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি চট্টগ্রাম শহরে কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯০৬ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই সালে চট্টগ্রাম কলেজ এফএ পড়ার সময় অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবিরের কাছে বেণীমাধবের পালি শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। এফএ (বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট বা আইএ) পাস করার পর বেণীমাধব বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে অনার্স সহ বিএ পাশ করেন।

১৯১১ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিতে ভর্তি হয়ে ১৯১৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। কৃতিত্বের সাথে এমএ পাশ করার সাথে সাথে বাংলার শিক্ষাজগতের দিকপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষের দৃষ্টি প্রতিভাবান বেণীমাধবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্যার আশুতোষ ১৯১৩ সালে তরুণ প্রতিভাদীপ্ত বেণীমাধবকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিতে অস্থায়ী লেকচারার পদে নিযুক্তি দেন। এখান থেকেই বেণীমাধবের সারা জীবনব্যাপী জ্ঞানচর্চার যাত্রা শুরু হয়।

কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির ও স্যার আশুোতোষের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিভাবান বেণীমাধব লন্ডনে উচ্চতর গবেষণাকর্মের জন্য সর্বপ্রথম ভারতীয় হিসেবে বৃটিশ সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে স্টেট স্কলারশীপ নিয়ে ১৯১৪ সালে ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। মাত্র ২৬ বছরের যুবক বেণীমাধব লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিবর্তনের উপর মৌলিক গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হন। এখান থেকেই ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার দার্শনিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল : Indian Philosophy : Its origin and growth from the Vedas to the Buddha. এই দার্শনিক গবেষণা কর্মের জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৭ সালে ১৮ জুলাই বেণীমাধব বড়ুয়াকে ডিলিট ডিগ্রিতে ভূষিত করেন। ড. বড়ুয়া ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম ডি. লিট এমনকি এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি লাভ করেন।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনায় বেনীমাধব বড়ুয়া পথিকৃৎ। ড. বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯৪৮ সালে ২৩ মার্চ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় অধ্যক্ষের দায়িত্বে সমাসীন ছিলেন। এ ছাড়া ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে এবং ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত বিভাগে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এবং শিলালিপি বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। আচার্য বেণীমাধব সমগ্র জীবনব্যাপী কোলকাতা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় নিয়োজিত থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি, শিলালিপি, ভাস্কর্য, প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মবিজয়ী সম্রাট অশোকের কীর্তি ও জীবনকথা এবং বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে ইংরেজীতে ১৮ টি মৌলিক গ্রন্থ, বাংলায় ৭টি গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকায় ইংরেজীতে ৮৬টি তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ ও বাংলায় ২২ টি প্রবন্ধ রচনা করে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

১৯৪৮ সালে ২৩ মার্চ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ীতে ফেরার পর মধ্যরাত্রে তিনি জীবন থেকে বৃন্তচ্যুত হয়ে গেলেন।

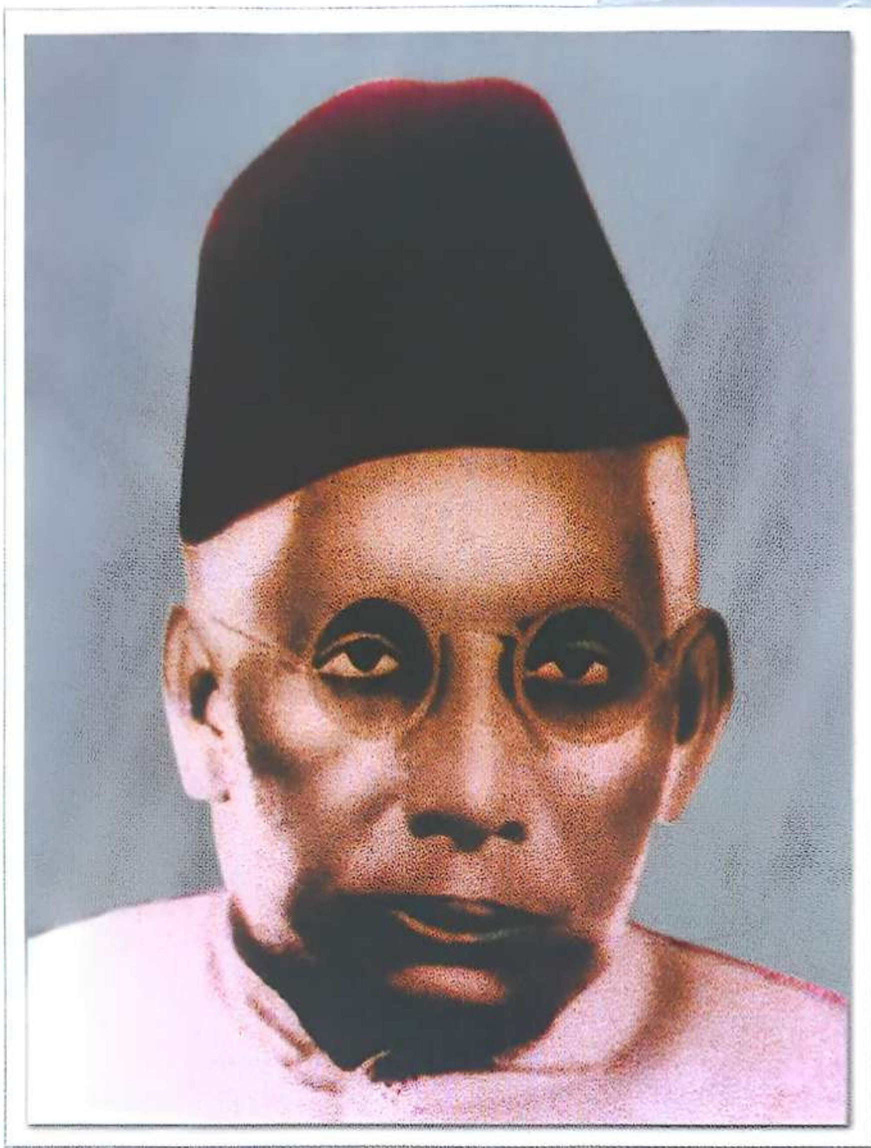

নূর আহমদ চেয়ারম্যান (১৮৯০-১৯৬৪)

চট্টগ্রাম শহরে আলকরণের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে নূর আহমদ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯০ সালের ২৫ ডিসেম্বর। পিতা হাজী আমজাদ আলী প্রথম জীবনে ছিলেন একজন শিক্ষক। এনায়েতবাজার প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক বৃত্তি লাভের মধ্য দিয়ে তিনি এ' অধ্যায়ের সূচনা করেন। নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও তিনি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১০ সালে কৃতিত্বের সাথে জেলা বৃত্তি নিয়ে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা (এনট্রান্স) পাশ করেন।

মেধার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে ১৯১২ সালে বিভাগীয় বৃত্তি নিয়ে প্রথম বিভাগে আইএ পরীক্ষা এবং একই কলেজ থেকে ১৯১৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স সহ বিএ পাশ করে মেধা বৃত্তি লাভ করেন।

১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অসাধারণ কৃতিত্বের সাথে প্রথম স্থান অধিকার করে এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তিতে তিনি চ্যান্সেলর্‌স স্বর্ণ পদক লাভ করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৭ সালে প্রথম শ্রেণীতে বিএল ডিগ্রী লাভ করেন এবং চট্টগ্রাম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। ১৯১৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন। ১৯২১ সালে চট্টগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ১৯২৭ সালে পৌর এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন, এহেন নানা উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কর্মকাণ্ড করে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। তাঁর এ কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য সর্বমহলে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। অবিভক্ত বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে জনাব নূর আহমদ বৃটিশ শাসনামলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করে চট্টগ্রাম পৌরসভার পক্ষ থেকে তৎসময়ে পাঁচশ টাকার একখানা চেক প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নিকট হস্তান্তর করেছিলেন । পাকিস্তান প্রথম গণ-পরিষদে তিনি ৭ বৎসর যাবত সদস্য থেকে পার্লামেন্টারী ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ প্রশ্নকর্তার সম্মান লাভ করেন।

জনাব মুস্তাক আহমদ তাঁর 'Goverment and Politics in Pakistan' গ্রন্থে লিখেছেন, 'The question hour was virtually a monopoly of Mr Nur Ahmed. In the 1953 budget session out of a total of 1140 questions to which oral or written replies were given, 468 were asked by Mr Nur Ahmed alone'.

জনাব নূর আহমদ চেয়ারম্যান একাধারে জ্ঞানের প্রচারক ও জ্ঞানের সাধক ছিলেন। পৌরসভা এবং রাজনৈতিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি চৌদ্দখানা ইংরেজী বই লিখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হচ্ছে : East Pakistan as it is now and some of its urgent needs and requirements, Pak Constitution : a comprehensive commentary, Some glimpses into the lives and characters of great men of Islamic World, Islam and Its Holy prophet as Judged by the non-Muslims, etc.

অম্বিকা চক্রবর্তী (১৮৯২-১৯৬০)

রাউজান থানার দেওয়ানপুরে জন্ম। পোর্ট অফিসে কেরানির চাকরি। মাস্টারদার সংস্পর্শে চাকরিতে ইস্তফা। বিপ্লবী দলের প্রতিষ্ঠাতা। রেলওয়ের টাকা ডাকাতির পর পুলিশের সাথে যুদ্ধে ধৃত। বিচারে মুক্তি। ১৯৩০ সালে টেলিফোন অফিস আক্রমণে নেতৃত্ব ও জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। পটিয়া থানার চক্রশালায় আত্মগোপন, পুলিশের অতর্কিত হামলায় ধৃত, বিচারে দ্বীপান্তর, ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কারাভোগ।

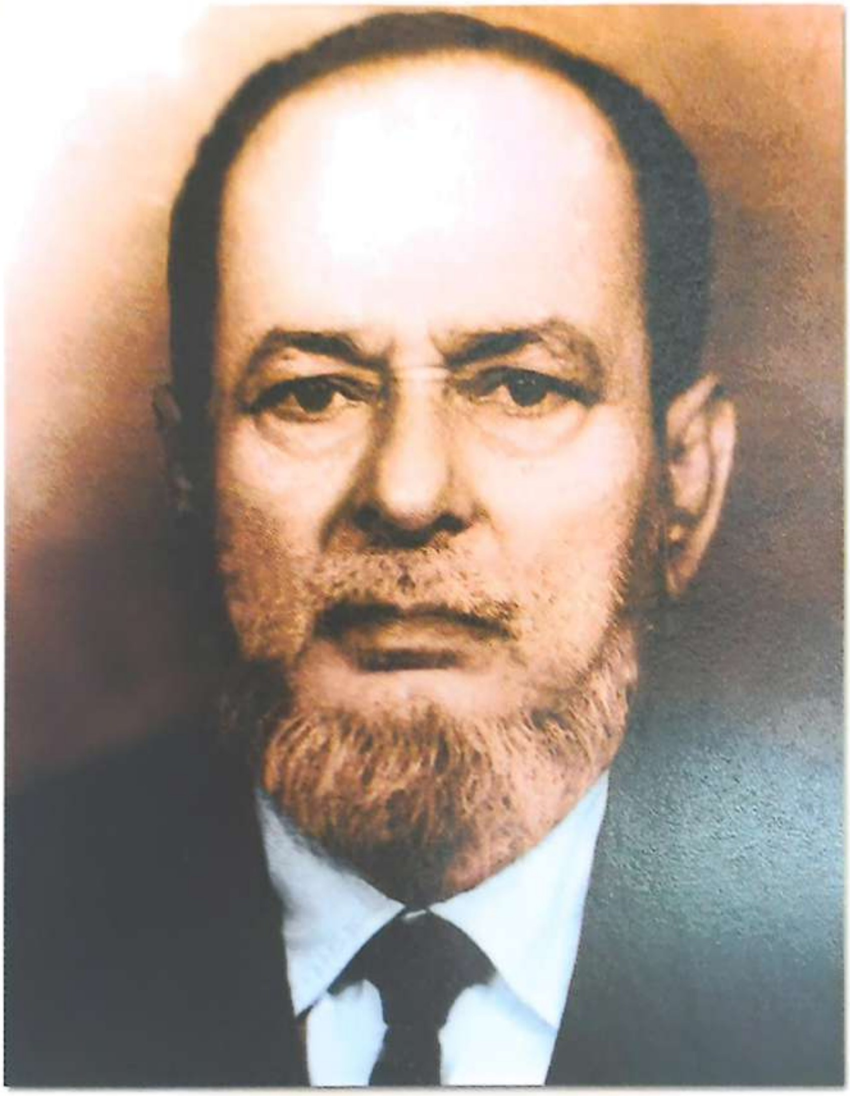

ডাক্তার এম এ হাসেম (১৮৯৪-১৯৭০)

তৎকালীন বাংলার প্রথম মুসলমান এমবি ডাক্তার এম এ হাসেম রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মফজ্জল আলী ও মাতার নাম ছিল বদিউন্নেছা। ১৯১৩ সালে ১৫ টাকার বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম কলেজে আইএসসি-তে ভর্তি হয়ে ১৯১৫ সালের ১৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে আইএসসি পাশ করেন এবং কলিকাতার বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এটাই ছিল একমাত্র মেডিকেল কলেজ।

উক্ত কলেজে মাত্র দুটো সিট মুসলিম ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ ছিল। তাঁর মেধাবলে উক্ত কলেজে ভর্তি হতে সমর্থ হন এবং ১৯২৩ সালে কৃতিত্বের সহিত এমবি পাশ করেন। অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন যুবক ডা. হাসেম সাহেবকে দু' বছর কলিকাতায় চাকুরি করতে হয়। এ সময় রেঙ্গুনে অবস্থানরত তাঁর আত্মীয়বর্গের চাপে তাঁকে রেঙ্গুনে যেতে হয়। সেখানে ডাক্তারি আরম্ভ করেন এবং একাধিক্রমে ৬ বছরকাল তথায় অবস্থান করেন। পরে তিনি রেঙ্গুনের নানা ভোগসামগ্রী ত্যাগ করে মাতৃভূমির আকর্ষণে ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে ফিরে আসেন এবং বর্তমান আন্দরকিল্লাস্থ ডাক্তারি পেশা আরম্ভ করেন। বাঙালী মুসলমানদের ব্যবসা, বানিজ্যে প্রেরণা যোগানোর জন্যে 'বেঙ্গল বার্মা ষ্টিম শীপ' কোম্পানী গঠনে তিনি সাহায্য করেন। মহাত্মা গান্ধীর রেঙ্গুন সফরকালে প্রবাসী বাঙালীদের পক্ষ থেকে তিনি মানপত্র পাঠ করেন। চট্টগ্রাম ইয়ুথ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী রূপে যুব সম্প্রদায়কে দেশসেবা ও দেশপ্রেমে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন তার তুলনা বিরল।

১৯৩৬ সালে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর নির্বাচনে তিনি সক্রিয় প্রচার-অভিযান পরিচালনা করেন। কদম মোবারক এতিমখানা, মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি ও সোসাইটি স্কুল, চট্টগ্রাম-নাইট কলেজ (বর্তমান সিটি কলেজ) তাঁর সেবা-কাজের অমর স্বাক্ষর বহন করছে। ১১ আগস্ট ১৯৭০ সাল সকাল ৭.২২ মিনিটে দুনিয়ার সব সেবা, সব মায়া ত্যাগ করে পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান।

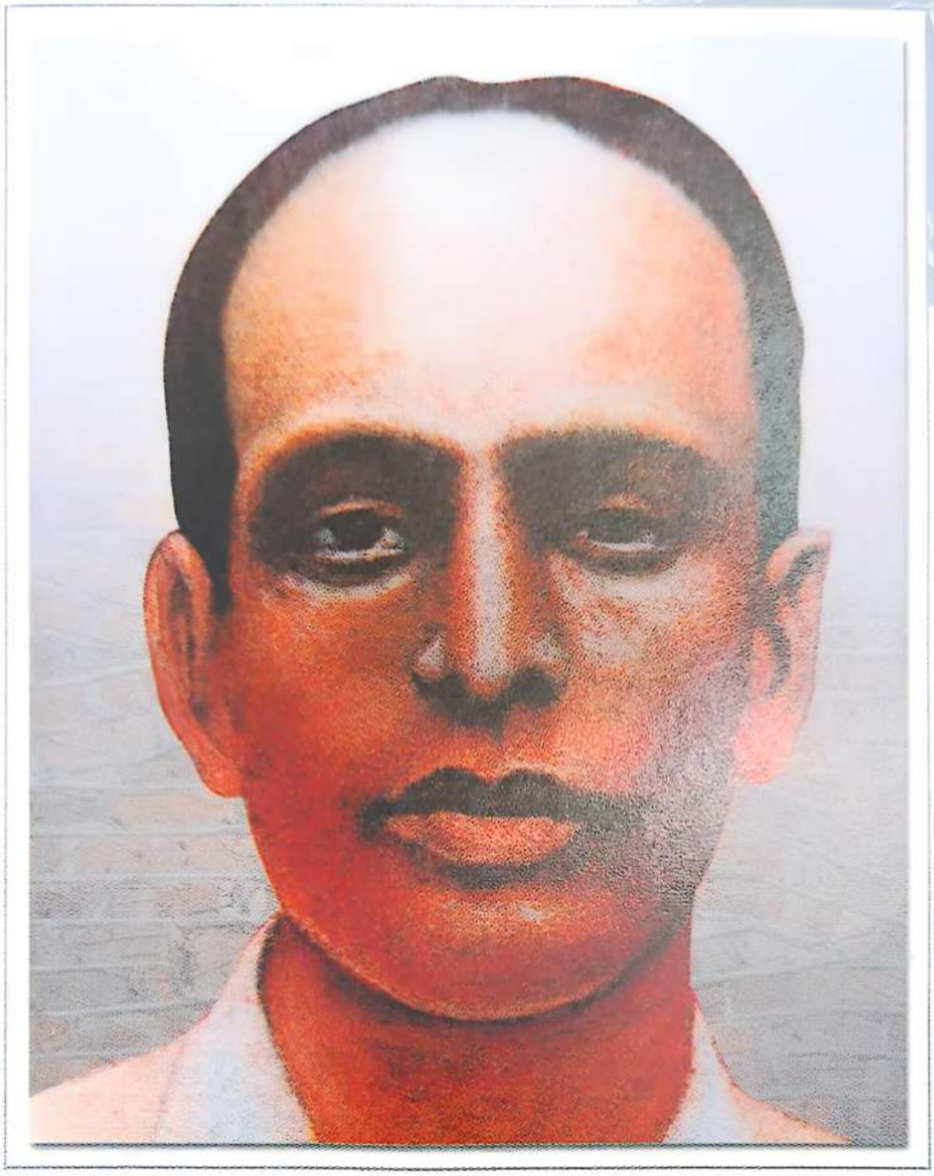

মাস্টারদা সূর্য সেন (১৮৯৪-১৯৩৪)

রাউজান থানার নয়াপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা রাজমণি সেন, মাতা মনোরমা দেবী। 'মাষ্টারদা' নামেই তিনি পরিচিত। পল্লী বাঙলার এই ভাল ছেলেকে লেখাপড়ার সময়ে বা বিপ্লবী নেতারূপে দেখেও সাধারনভাবে বলা যেত না তাঁরই ভয়ে ১৯৩০ খ্রী. থেকে ব্রিটিশ শাসকরা অনিদ্রায় কাল কাটিয়েছে। প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজ ও পরে বহরমপুর কলেজে পড়ে ১৯১৮ সালে বিএ পাশ করেন। মাষ্টারদা শেষোক্ত কলেজেই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং সুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হন। স্বগ্রামে ফিরে উমাতারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করে ধীরে ধীরে সংগঠন গড়তে থাকেন। তাঁর এসময়ের সঙ্গী ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, জুলু সেন ও নির্মল সেন প্রমুখ সহযোদ্ধা। ১৯২০ খ্রী. গান্ধীজী বিপ্লবীদের কাছে এক (১) বছরে স্বরাজ এনে দেবার প্রতিশ্রুতিতে সময় চান এবং অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন।

বাঙলার সকল বিপ্লবী দল অহিংসায় বিশ্বাসী না হলেও শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রতিশ্রুতির সন্ধানে এই আন্দোলনে যোগ দেন। মাষ্টারদাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন। অসহযোগ আন্দোলনের পরেও ব্যর্থতা এলে শুরু হয় ২য় বিপ্লবী তৎপরতা। মাষ্টারদা অল্প অল্প করে সংগঠন গড়ছিলেন। এ সময়ে তিনি বাঙলা ও ভারতের বহু স্থানে বিপ্লবী কাজে হাতে-কলমে অংশ নেন। অর্থ ও অস্ত্র-সংগ্রহের জন্য তাঁকে প্রায়ই কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে অভিজ্ঞ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত। মাষ্টারদা একটি অনন্যসাধারন যুবকদলকে সংগঠনে আনতে পেরেছিলেন। এই দলের প্রথম অ্যাকশন ২৩-১২-১৯২৩ সালে চট্টগ্রাম শহরে সরকারী রেলের টাকা লুন্ঠন। এতে অনন্ত সিং, দেবেন দে ও নির্মল সেন প্রত্যক্ষ অংশ নেন। কয়েকদিন পর চট্টগ্রাম পুলিশের এক কর্মচারী অকস্মাৎ সদলে তাঁদের গোপন কেন্দ্রে হানা দেয়। বেষ্টনী ভেদ করে যাওয়ার সময় খন্ডযুদ্ধ হয়, পুলিশ তাঁর সন্ধান পায়নি। মাষ্টারদা আত্মগোপন করে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠন গড়েন। হঠাৎ ধরা পড়ে যান, কিন্তু মামলায় পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমান উপস্থিত করতে পারেনি।১৯২৪ সালে টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার পর গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ সালে তিনি মুক্তি পান। তারপর থেকে চট্টগ্রাম শহরের দুইটি অস্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল করে অল্পদিনের জন্য হলেও একটি এলাকা থেকে ব্রিটিশ শাসন মুছে দিতে হবে এই পরিকল্পনা নিয়ে মাষ্টারদা কাজ শুরু করেন। পরিকল্পনা দেন দলের অন্যতম সদস্য গণেশ ঘোষ। ১৮.৪.১৯৩০ সালে সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদার নেতৃত্বে ৬৫ জন অসম সাহসী যুবক ২টি অস্ত্রাগার ও পুলিশ লাইন এবং ডাক ও তার অফিস একযোগে আক্রমন করে দখল করেন। সামান্য কয়েকটি রিভলভার, কয়েকটি সাধারণ বন্দুক সম্বল করে এই আক্রমন একমাত্র সূর্য সেনের বুদ্ধিকৌশলে আংশিক সফলতা লাভ করেছিল। অস্ত্রাগার দখলের সাথে সাথেই দলের অন্যতম নেতা গণেশ ঘোষ দলের অস্ত্রহীন সদস্যদের অস্ত্র দিয়ে তার চালনা কৌশল ও ব্যবহার শেখান। দলের পরিকল্পনা ছিল ব্রিটিশ শক্তিকে যথাসম্ভব কঠিন আঘাত হেনে মৃত্যুবরণ। তাঁদের সফল তৎপরতায় চট্টগ্রাম সারা ভারতের বিপ্লবতীর্থ বলে পরিচিত হয়। অস্ত্রাগার দখলের পর মাষ্টারদার বিপ্লবী ৬০ জন শহর ছেড়ে পাহাড় অঞ্চলে চলে যান। ২২-৪-১৯৩০ সালে গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে ব্রিটিশ বাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের ঘাঁটিতে আক্রমন করলে, লোকনাথ বলের নেতৃত্বে দুই পক্ষে সারা দিন প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মাষ্টারদা সারাক্ষণ নির্দেশ দান করেন এবং দলের মনোবল অব্যাহত রাখার জন্য বুকে হেঁটে নিজেই বিপ্লবীদের বন্ধুকের গুলি যুগিয়েছিলেন এবং বন্ধুক ব্যবহারযোগ্য করে দিয়েছিলেন। মাষ্টারদা শেষ পর্যন্ত অনুগামীদের এই নির্দেশ দেন, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন আপাতত প্রাত্যহিক স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যায় এবং যারা চিহ্নিত, তারা জেলা ছেড়ে অন্যত্র আত্মগোপন করে। নিজেও আত্মগোপন করে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখেন। গুপ্তচরের চেষ্টায় একদল যুবক ধরা পড়লেও আবার একদল মৃত্যুপ্রার্থী যুবক এবং শেষে তরুনীরাও এগিয়ে আসেন। ইংরেজ সরকার মাষ্টারদাকে গ্রেপ্তারের জন্য বহু টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসে ক্যাপ্টেন ক্যামেরূন নিহত হন। অবশেষে ১৬-২-১৯৩৩ সালে এক জ্ঞাতি ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতায় গৈরলা গ্রামে ধরা পড়েন। তাঁর এই গ্রেপ্তারের পরও দীর্ঘদিন কেউ সহসা বিশ্বাস করেনি যে মাষ্টারদা পাকড়াও হতে পারেন। চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সম্পাদক সশস্ত্র বিপ্লবের 'চিন্তানায়ক, চট্টগ্রাম বিদ্রোহের মহানায়ক বিচারে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হন এবং চট্টগ্রাম কারাগারে ফাঁসিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য মাষ্টারদার মৃত্যুর আগেই বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন ও গ্রেপ্তারকারী পুলিশ সদস্য মাখনলাল তাঁর অনুগামী বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়। চট্টগ্রামে মাষ্টারদার দলই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে ইউনিফর্ম পরে সন্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ন হয়েছিলেন। দলের অন্যতম, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারই প্রথম মহিলা সদস্য যিনি সশস্ত্র বিপ্লবী-কর্মে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমনে নেতৃত্ব দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ৪ বছর নির্মম নিস্পেশন চালিয়েও চট্টগ্রাম জেলায় মাষ্টারদার বিরোধী জনমত সৃষ্টি করা যায়নি। অগনিত লোক গ্রেপ্তার হলেও স্বীকারোক্তির ঘটনা একটিও ঘটেনি। তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহর ৪টা ঘন্টা ইংরেজ শাসনমুক্ত ও স্বাধীন ছিল।

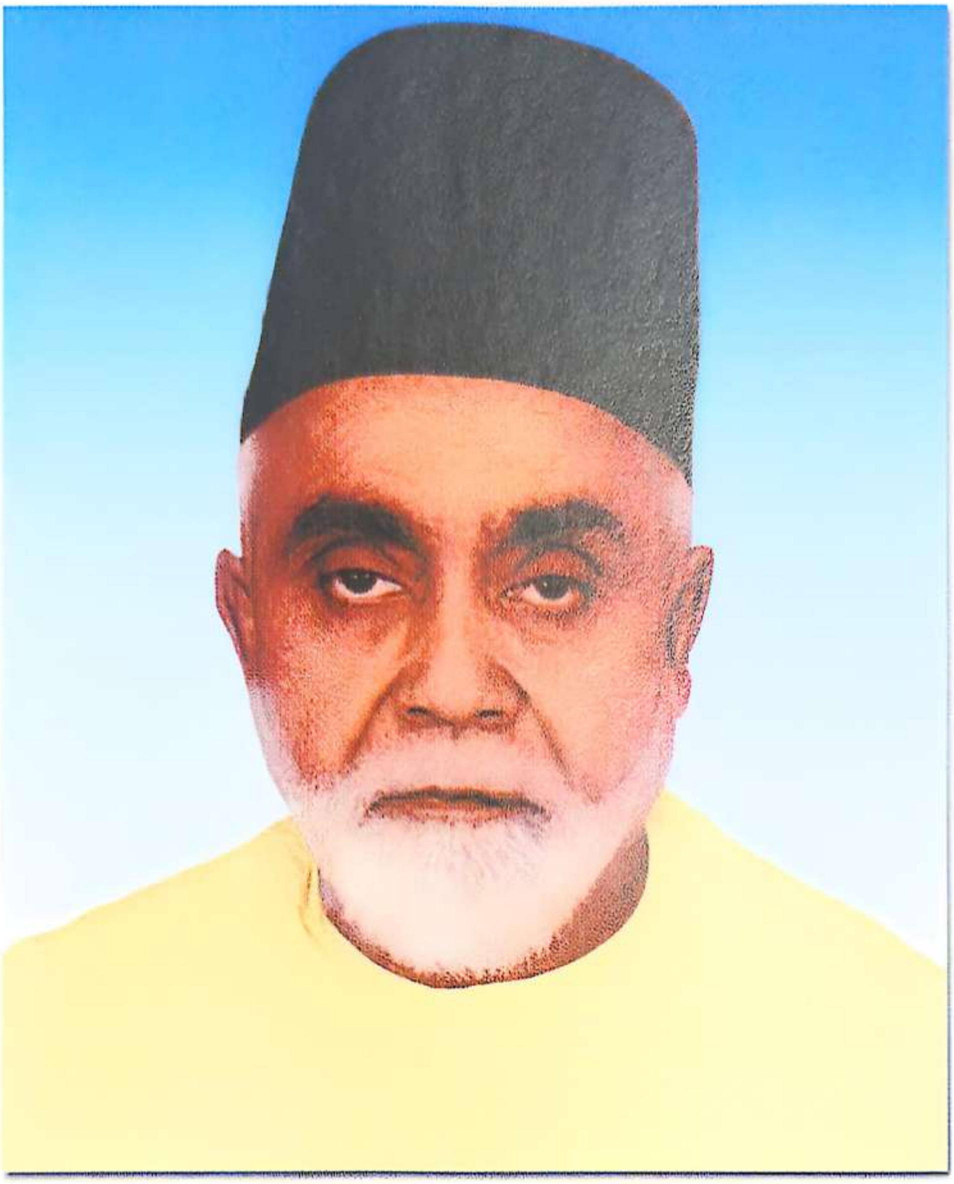

আলহাজ্ব ইসলাম খাঁ (১৮৯৬-১৯৭৪)

আলহাজ্ব ইসলাম খাঁ ছিলেন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্ব, যিনি একাধারে ধর্মানুরাগী, মানবহিতৈষী, সেবাপরায়ণ এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে সমাজে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আলহাজ্ব ইসলাম খাঁ ১৮৯৬ সালে চট্টগ্রামের বাটালী রোডস্থ এক সভ্রান্ত মুসলীম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। কৈশোরে পিতৃমাতৃহারা একমাত্র সন্তান, এক সংগ্রামী চেতনার মাধ্যমে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেন এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে।

পাকিস্তান আমলে এই দেশে যখন কোন পাঁচতারা হোটেল ছিল না তখন তিনি চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন এক আর্ন্তজাতিক মানের একটি হোটেল " হোটেল মিসকা"।

এ দেশে শিল্পবিনিয়োগেও তিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্লাইউড ফ্যাক্টরী- ষ্টারলিং প্লাইউড এবং বাংলাদেশ প্লাইউড ফ্যাক্টরী। এদেশের চা রপ্তানির ক্ষেত্রে এই দুটি ফ্যাক্টরীর উৎপাদিত পণ্য এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ধর্মানুরাগী এবং মানবহিতৈষী মানুষ হিসেবে তিনি মক্কা-মদিনায় প্রতিষ্ঠা করেন 'ইসলাম খান রুবাবিয়াত' নামে দুটি মোসাফেরখানা। বর্তমানে হজ্বনীতি পরিবর্তন হওয়ার কারণে এই দুটি মোসাফেরখানা মক্কা- মদিনায় বাংলাদেশ মিশন হিসাবে ওমরাহ্ পালন ও হজ্ব পালনকারীদের সেবা প্রদান করে আসছে।

বটতলী 'নাজির শাহ মাজার' নির্মাণ এবং তাঁর বাৎসরিক ওরশ তিনি জীবদ্দশায় নিজ দায়িত্বেই পালন করতেন। সমাজের গুনীব্যক্তিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য তিনি প্রতি বৎসর 'মিসকা হোটেলে' একটি খাসখানার আয়োজন করতেন। চট্টগ্রামের লাভ লেইনে 'মাদানী মসজিদ' তাঁর একক অবদানে প্রতিষ্ঠিত।

এছাড়া আন্দরকিল্লায় চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল পুনঃ নির্মাণ, ঢাকা, রমনায় তবলীগে মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং 'লায়ন্স' এর সেবা ধর্মী কর্মকান্ড তিনি যথেষ্ট আর্থিক অনুদান দিয়ে সহায়তা করেছেন। অসুস্থ তবলীগে জামাত লোকদের জন্য তিনি একটি হোমিওপ্যাথিক হোষ্টেলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তবলীগে জামাত মসজিদ সম্পসারণের কারণে তাঁর বিলুপ্তি ঘটে। তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এতিমখানাটি এখনও চালু রাখা হয়েছে। জীবদ্দশায় প্রতি বছর তিনি হজ্বব্রত পালন করতেন। এই মানব হিতৈষী মানুষটি ১৯৭৪ সনে পবিত্র হজ্ব ও কোরবানীর ঈদের দিনে বাটালী রোডস্থ নিজ বাস ভবনে পরলোক গমন করেন।

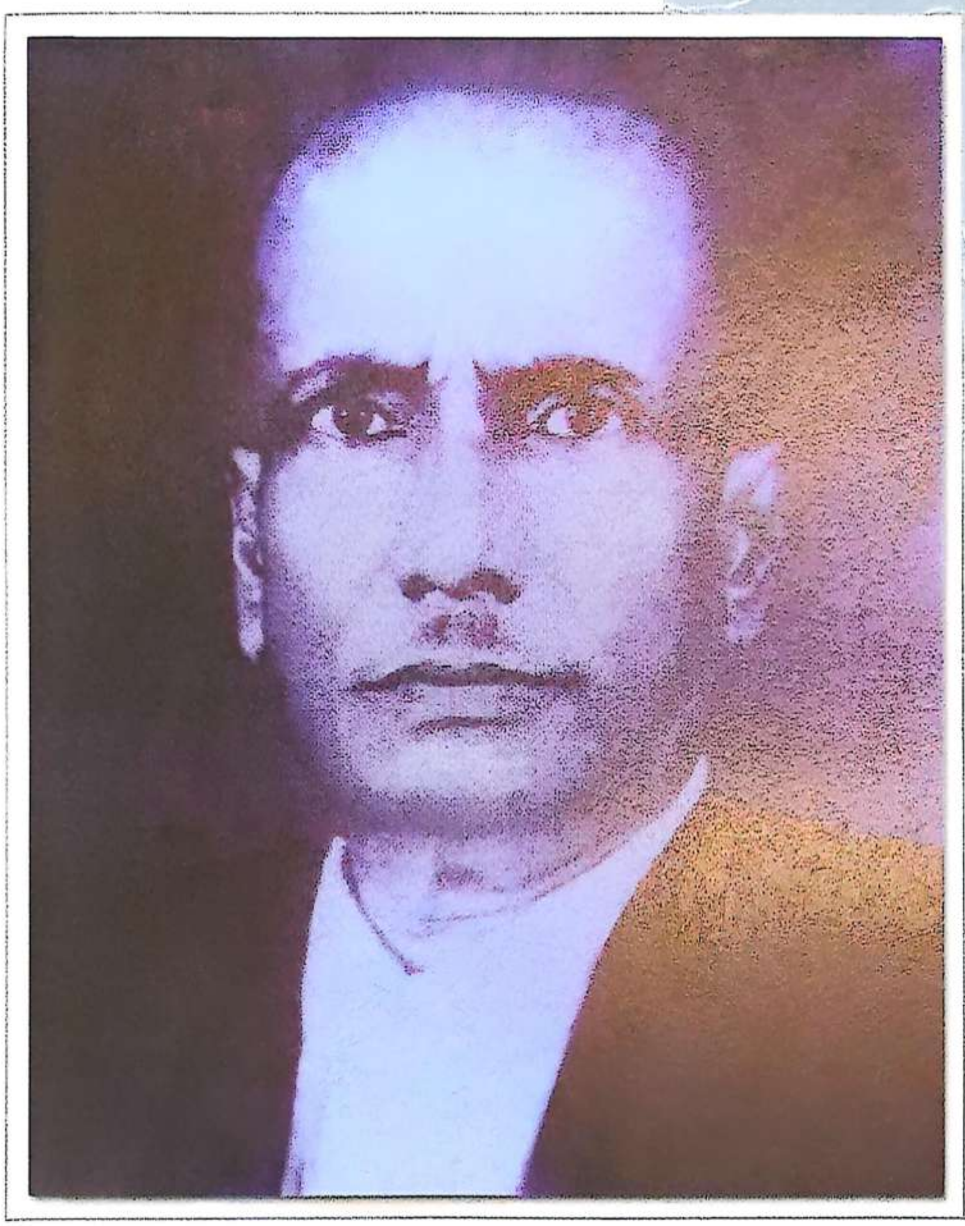

মুহাম্মদ আন্‌ওয়ারুল আজিম ব্যারিষ্টার (১৮৯৭-১৯৬৫)

হাসান আলী নিজের ছেলেকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমান আলী তাঁর পুত্রকে চূড়ান্ত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। এই পুত্র মুহম্মদ আন্‌ওয়ারুল আজিম। তিনি ১৯২২ সালে ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন। সেই বৎসরই ইন্নার টেম্পল থেকে ব্যারিষ্টারী সনদও হাসেল করেন। 'আজিম ব্যারিষ্টার' রূপে তিনি চট্টগ্রামের আপামর জন-সাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁর জন্ম হয় ১৮৯৭ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর।

১৯২৩ সালে আন্‌ওয়ারুল আজিমের সাথে বিয়ে হয় নোয়াখালীর খান বাহাদুর বজলুর রহীমের কন্যা তোহ্‌ফতুন্নিছার। তখন তাঁর বয়স মাত্র এগার বৎসর। এক প্রসিদ্ধ বংশের বহু বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এই বালিকার সহজ বিচার-বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। এই সময় থেকে ১৯৬৫ সালের ১লা মে তাঁর এন্তেকাল পর্যন্ত আমরা আন্‌ওয়ারুল আজিমকে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাই আইন-জীবি রূপে। তিনি ১৯৩০ সালে কলিকাতা বার-এ যোগদান করেন।

১৯৪৭ সালে তিনি নিজের শহর চট্টগ্রামকে চূড়ান্ত ভাবে তাঁর কর্ম-স্থল করে নেন। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট্ ছিলেন। ১৯৫০ থেকে '৫৪ পর্যন্ত তিনি গভর্ণমেন্ট্ এডভোকেট ছিলেন। ১৯৪৮ হইতে '৫২ পর্যন্ত তিনি ঈষ্ট বেঙ্গল রেলওয়েজ-এর আইন-পরামর্শদাতা ছিলেন। চট্টগ্রামে আইন-কলেজ স্থাপিত হলে তিনি এর প্রথম প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। শিক্ষাবিদ রূপে তিনি খান বাহাদুর আবদুল আজিজ 'বি-এ' কর্তৃক চট্টগ্রামে 'মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি' গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী ও বিশ্বস্ত কর্মী রূপে তাঁকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। এই সোসাইটি চট্টগ্রামের মুসলমানদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে দেয়ার ব্যাপারে এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেটের মেম্বার ছিলেন এবং দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়, আলীগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের (১৯২৬-৪৬) কোর্টের মেম্বার ছিলেন। তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'অল ইন্ডিয়া ওল্ড্ বয়েজ এসোসিয়েশন'-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মেম্বার মনোনীত হন। আইনানুগ আন্দোলনকারী। তাঁর প্রবণতা ছিল আইনের ভিতর থেকে গঠন-মূলক আন্দোলন করার দিকে। এই গুণটি তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে পেয়েছিলেন।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রায় ১৯৩৮ পর্যন্ত সদস্য থাকেন। তিনি জয়াকার কমিটির সদস্য মনোনীত হনঃ (১৯২৬-৩০) সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের সংশোধনে তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন (১৯২৯-৩০)। ১৯৩৮ সালে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। ভারত সরকার ১৯৩৬ সালে তাঁকে করোনেশন মেডেল দিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই বৎসর 'খান বাহাদুর' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। পরে মুস্‌লিম লীগের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তিনি এই উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯৩৮ থেকে '৪৬ পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য ছিলেন। ১৯৩২ থেকে '৪২ তিনি চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। কিছু দিন তিনি খাদেমুল ইনসান সমিতির সাথে ও জড়িত ছিলেন।

জাকির হোসাইন গভর্নর IP JP PSP (১৮৯৮-১৯৭১)

জাকির হোসাইন ১৮৯৮ সালের ২রা নভেম্বর চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রহমান আলি। তিনি ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। জাকির হোসাইন তাঁর পিতার ছয় সন্তানের মধ্যে একমাত্র পুত্র ও বড় সন্তান। তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তিসহ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভারতের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

জাকির হোসাইন ১৯২৫ সালে অবিভক্ত ভারতের প্রথম মুসলমান যিনি পুলিশ বিভাগে নিয়োগ লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং ভারত বিভক্তির সময় তিনি ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ভারত পাকিস্তান বিভক্তের সময় তিনিও অন্যান্য মুসলমানদের মত পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিলেন। সে সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে তিনি পাকিস্তানের প্রথম ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদে নিযুক্তি লাভ করেন। পরে ১৯৫৮ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং ১৯৬১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মির সংকান্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৬৪ সালে তাঁর মাতৃভূমি চট্টগ্রামে চলে আসেন এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তৎমধ্যে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, ৫০০ বেডের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাঙ্গুনিয়া কলেজ, বেগম ইকবাল জাকির হোসাইন স্কুল প্রভৃতি। রাঙ্গুনিয়ায় একটি মহিলা কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ও তাঁর বড়ছেলে জাহিদ হোসাইন তাঁর হিলটপস্থ বাসস্থানে অবস্থান করছিলেন । তখন পাকিস্তানী আর্মীরা তাঁর বাসা আক্রমণ করে নিরাপত্তা প্রহরী ও চাকর-চাকরানীদের মেরে ফেলে। পরে তাঁকে ও তাঁর বড় ছেলেকেও মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে লাইনে দাঁড় করায়। ইতিমধ্যে ঐ সেনাদলের নেতৃত্ব দানকারী অফিসার তাঁদেরকে থামান, ফলে তাঁরা বেঁচে যান। ঐ ঘটনার পর তিনি কিছু দিনের জন্য এমএম ইস্পাহানী সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে বিহারীরা তাঁর ঘর দখল করে নেয়। ঐ সময় তিনি ফেরত এসে ওদেরকে বের করে দিয়ে বাড়ি দখলমুক্ত করেন এবং তাঁর বাসাকে বাসযোগ্য করে তোলেন। কিন্তু বিহারীদের দ্বারা তাঁর বাসা দখলের কারণে যে মনঃ কষ্ট পেয়েছিলেন তা সহ্য করতে না পেরে তিনি ১৯৭১ সালের ২৪শে মে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর নামাজের জানাজার জন্য তৎকালীন পাক সরকার ক্ষণিকের জন্য কারফিউ শিথিল করে এবং ঐতিহাসিক লালদীঘির ময়দানে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে গরিবুউল্লাহ্ শাহ্ (রঃ) মাজারস্থ কবর স্থানে সমাহিত করা হয়।

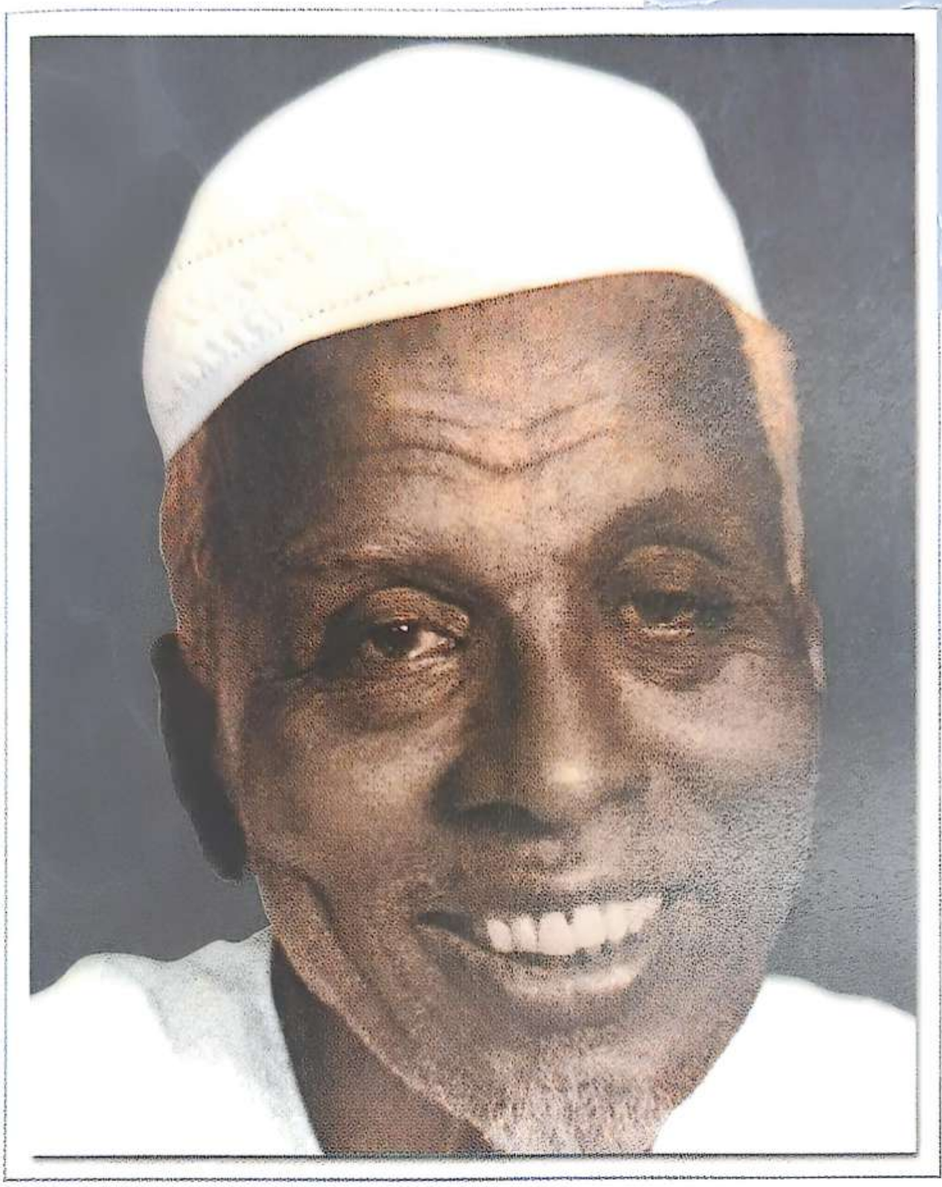

মাহ্বুব উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১)

বাংলা সাহিত্য জগতের অন্যতম কৃতী পুরুষ প্রয়াত সাহিত্যিক মাহ্বুব উল আলম চট্টগ্রামের ফতেপুর গ্রামে **১**লা মে **১৮৯৮** সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মৌলভি মাসহুদ্দীন ও বেগম আছিমুন্নেসার চার সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র সন্তান। তাঁর অগ্রজ শামস্ উল আলম এবং অনুজদ্বয় দিদারুল আলম ও ওহীদুল আলম। চার ভাই-ই সাহিত্যে নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে মাহ্বুব উল আলম প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে যুদ্ধের অসীম অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি রচনা করেন 'পল্টন জীবনের স্মৃতি'।

লেখায় জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয় বলে তিনি জীবনশিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সাড়া-জাগানো আত্ম- জৈবনিক উপন্যাস 'মোমেনের জীবনবন্দী' ইংরেজী ও উর্দুতে অনূদিত হয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে তা পাঠ্য রূপে বিবেচিত হয়। তাঁর বহু-আলোচিত উপন্যাস 'মফিজন' আজকের দিনেও আধুনিক শিল্পকর্ম হিসাবে যোগ্যতার দাবী রাখে। তাঁর হাস্য-রসাত্মক গল্প-সংকলন 'গোফ সন্দেশ' বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সাহিত্যে মৌলিক চিন্তাধারার জন্য তিনি সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার 'গাইড অব্ পারফরমেন্স' 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' ও একুশে পদকসহ বহু পুরস্কার লাভ করেন।

সাহিত্যের পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫৩ সালে পেনশন-প্রাপ্তির পর এই কর্মী পুরুষ মাহ্‌বুব উল আলম 'জমানা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সেখানে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর সম্পাদকীয় অনুকরণীয় রচনাশৈলীর জন্য তিনি আজীবন পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণক্রমে মার্কিন মুলুক সফর করেন এবং ফিরতি পথে হজব্রত পালন করেন।

৩২টির অধিক পুস্তক রচয়িতা মাহ্‌বুব উল আলম তাঁর একাগ্র সাধনা ও অনলস প্রচেষ্টা দ্বারা ৭ বছরের কঠোর পরিশ্রমে সর্বাধিক তথ্যসমৃদ্ধ ১২০০ পৃষ্ঠার 'বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' (চার খণ্ডে) রচনা করেন। তাঁর জীবদ্দশায় এটিই তাঁর শেষ গ্রন্থ। তাঁর মরণোত্তর হাস্য-রসাত্মক গল্প সংকলন 'প্রধান অতিথি' ও 'তাজা শিংগী মাছের ঝোল' পাঠক মহলে বিপুল সাড়া জাগায়। ১৯৮১ সালের ৭ই আগস্ট কাজির দেউড়ীর নিজ বাসভবনে এই কৃতী পুরুষের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

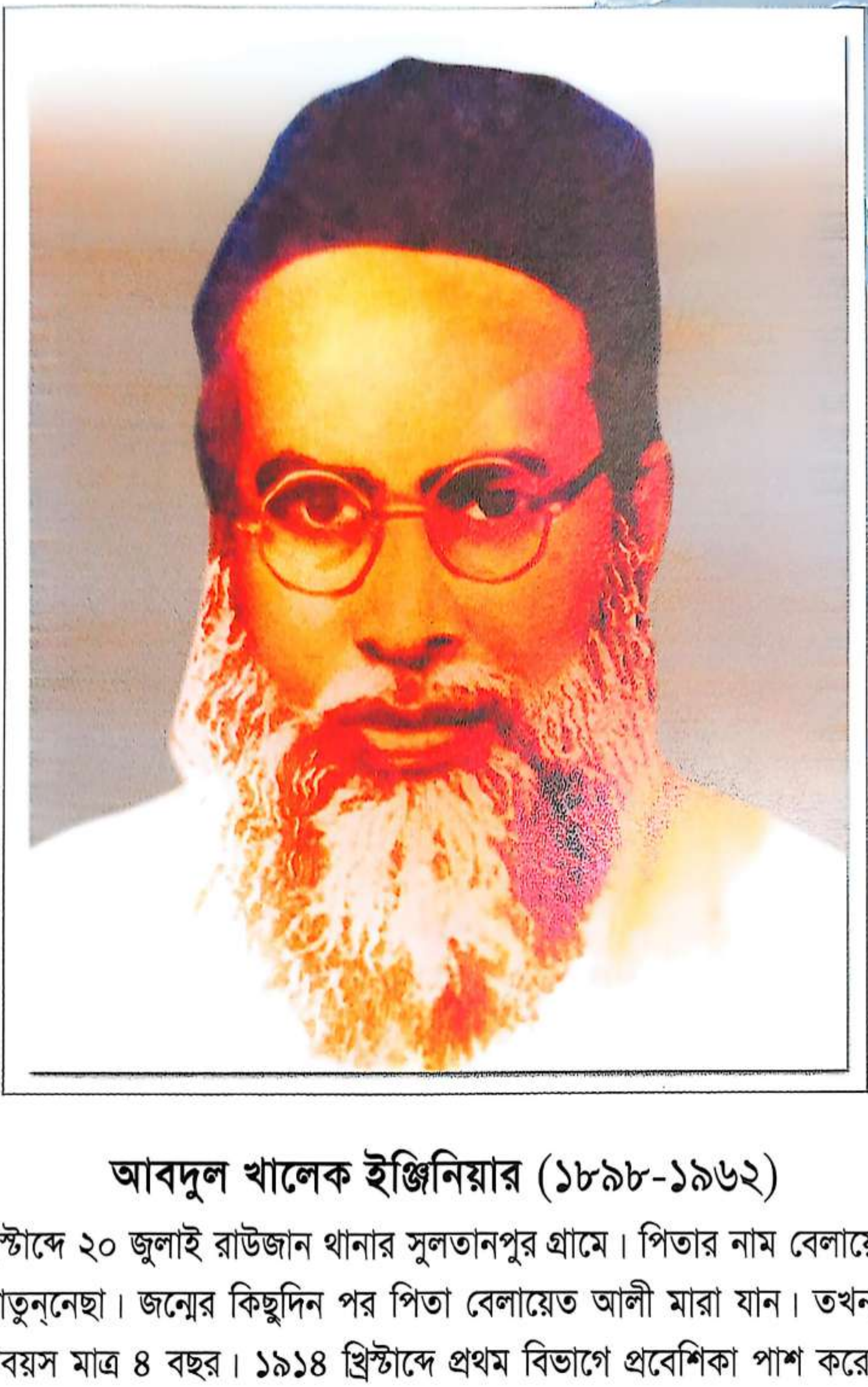

আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার (১৮৯৮-১৯৬২)

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ২০ জুলাই রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে। পিতার নাম বেলায়েত আলী ও মা ফজিলাতুন্নেছা। জন্মের কিছুদিন পর পিতা বেলায়েত আলী মারা যান। তখন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বয়স মাত্র ৪ বছর। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেন। তারপর তিনি ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাশ করেন। ভারতের শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন এবং তিনিই ছিলেন সেই সময়ে চট্টগ্রামে মুসলমান সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীধারী।

তৎকালে রেংগুনে (বর্তমান ইয়াংগুন) চট্টগ্রামী ও ভারতীয়দের জন্যে ছিল আকর্ষণীয় চাকুরী ও ব্যবসা-ক্ষেত্র। সেই সময়ে রেংগুনে বাঙালি মসজিদের ইমাম ছিলেন হজরত শাহেন শাহ-এ ছিরকোটি। হাফেজ ক্বারী মৌলানা সৈয়দ আহমদ ছিরকোটি (রঃ) সাহেব তাঁর হাতে বায়েত হন। এ সময় একটি লোভনীয় চাকরির প্রস্তাবও পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বদেশের প্রতি অগাধ ভালোবাসার টানে তিনি সে সুযোগ নেননি। তিনি অনুধাবন করলেন সাহিত্য সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে ছাপাখানা। সেই আলোকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিদ্যুৎ-চালিত ছাপাখানা তথা কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস স্থাপন করলেন। এটিই চট্টগ্রামের প্রকাশনা শিল্পে ছিলো তাঁর ঐতিহাসিক অবদান। তারপর তিনি ইলেকট্রিক কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো 'সাপ্তাহিক কোহিনূর'। কোহিনূর প্রেস ও পত্রিকাকে ঘিরে চট্টগ্রামে গড়ে উঠে একটি সৃজনশীল সাহিত্য গোষ্ঠী। কালে কিছু নাম ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে থাকে নানাবিধ কর্মকাণ্ডে। তেমনি এক অমর নাম মরহুম মোহাম্মদ আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ছিলেন সামগ্রিক মানব-কল্যাণের জন্য আজীবন উৎসর্গীকৃত এক নিবেদিত-প্রাণ পুরুষ মহান সত্তা। অনন্ত উৎস থেকে উৎসারিত এক পবিত্রতার মহা অভিজ্ঞান। এ পবিত্রতা নিষ্কাম মানব প্রেমের উজ্জ্বলতায়, উদ্দীপ্ত, ঐশ্বরিক একাত্মতার অভিষেকে অভিষিক্ত, চির ভাস্বর। মানব-কল্যাণের জন্য আত্ম-উৎসর্গ করে তিনি মানবতার প্রেমিক রূপে চিরঞ্জীব হয়ে আছেন। মুদ্রণ, সাংবাদিকতা, পাঠাগার, মাতৃভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, কাব্যচর্চা, আধ্যাত্মিকতা, ধার্মিকতা, মানবতা প্রভৃতির প্রসারে ও প্রচারে তিনি মূল্যবান অবদান রেখেছেন। চট্টগ্রামের বহুল প্রচারিত 'দৈনিক আজাদী' তাঁর অমর কীর্তি। এই মহান মানুষটির সামগ্রিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণে যে বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তা হলো, তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ মুসলমান এবং একজন সৎ মানুষ। তিনি নিতে জানতেন যোগ্য কাজের জন্য যোগ্য মানুষ। আজ তাঁরই বদৌলতে সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্মীয় মনোভাবের এতটুকু প্রসার ঘটেছে। এই মহান-প্রাণ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ সেবা ও সংবাদপত্র জগতের কীতিপুরুষটি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ২৫ সেপ্টেম্বরে।

শেখ রফিউদ্দিন আহমদ ছিদ্দিকী (১৮৯৮-১৯৬৮)

চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রথম মুসলিম গ্র্যাজুয়েট। রেয়াজুদ্দীনের একমাত্র পুত্র শেখ রফিউদ্দিন আহমদ ছিদ্দিকী ১৮৯৮ সালের ১২ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। রফিউদ্দিন ছিদ্দিকী যখন কলিকাতার স্কুল ছাত্র তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে আমরা তাঁহাকে মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের উৎসাহী অনুচর ও কর্মী রূপে দেখিতে পাই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থায় তাহাকে কারাবাস ভুগিতে হয়।

এতে তাঁহার অধ্যয়ন ব্যাহত হইয়া পড়ে। মুক্তিলাভের পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি বি-এ পাশ করেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ এর আগ পর্যন্ত প্রায় দুই 'টার্ম' বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লী'র সদস্য ছিলেন। এই সময় তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের (বর্তমানে সিন্ডিকেট) সদস্য নির্বাচিত হন। প্রায় তিন বৎসর এই পদে থাকিয়া মুসলিম শিক্ষা প্রসার কালে তিনি বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় সরকার ভীষণ দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করতে গিয়ে ধান ও চাউলের স্থানান্তর নিষিদ্ধ করিয়া এক ভ্রান্ত নীতির অনুসরণ করেন। রফিউদ্দিন ছিদ্দিকী ইহাতে লোকের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ আরও বৃদ্ধি পাইবে বুঝিতে পারিয়া ইহার প্রবল বিরোধিতা করেন। সরকার তাঁহাকে গ্রেফতার করেন। কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন এবং ঐ আদেশ প্রত্যাহার করেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত তিনি অনারারি একক বেঙ্গ সম্পন্ন মেজিট্রেটের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৯৪২-৪৩ সালে জাপানের সহিত যুদ্ধের ফলে বিপর্যস্ত হইলে তথাকার বহু ভারতীয় অধিবাসী চট্টগ্রামে আসিয়া আশ্রয় নেয়। রফিউদ্দিন ছিদ্দিকী তাহাদের পুর্ণবাসনের কাজে প্রাণ পণ পরিশ্রম করেন। তিনি ১৯৩৫ হইতে ১৯৫৪ পর্যন্ত মুসলিম লীগের ডিষ্ট্রীক্ট প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৫০ সালে কলিকাতা দাঙ্গার পর চট্টগ্রামে বহু শরণার্থীকে তিনি সাহায্য করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ও বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করবার জন্য সংগ্রাম চালাইয়া গিয়েছিলেন।

তিনি অনেকগুলো সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন যেমন-চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির দুই টার্ম চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট এর দুই টাম ভাইস চেয়ারম্যান মুসলিম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রী ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাহাকে মন্ত্রী, রাজদূত এবং গভর্ণরের পদবিতে চাওয়া হইয়াছিল। লর্ড ওয়াভেল তাঁহাকে 'নাইট' খেতাব দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রফিউদ্দিন ছিদ্দিকী এইসবের প্রতি কোন আগ্রহ ও স্পৃহা বোধ করেন নাই। এই সকল অনুগ্রহ হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া নিজের জ্ঞান ও বিবেক মতে তিনি জাতি ও সকলের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ মোহাম্মদ ওমর (১৮৯৯-১৯৫১)

হাট হাজারী থানার ছাদক নগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মোহাম্মদ ওমরের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব আলী হোছেন চৌধুরী। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চট্টগ্রামের মুসলীম সমাজ ছিল পশ্চাৎপদ ও অশিক্ষা কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তখন কবিরাজ ও শাস্ত্রীয় চিকিৎসার প্রচলন ছিল। তাই চিকিৎসা বলতে মানুষ জানতো কবিরাজ, বৈদ্যকে। এ সময়ই ১৯২২ ইং তে ডাঃ মোহাম্মদ ওমরকে কলকাতার বেঙ্গল কমার্শিয়াল অব মেডিকেল রেজিষ্ট্রেশন সনদ পত্র প্রদান করেন এবং তিনি এম.বি ডিগ্রী লাভ করেন। সে সময় থেকে তিনি চট্টগ্রামে চিকিৎসা শুরু করেন। তিনি চট্টগ্রামের প্রথম মুসলিম গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসক ছিলেন।

তিনি যে একজন সু-চিকিৎসক ছিলেন তা নয়, তিনি একজন হৃদয়বান সমাজ সেবীও ছিলেন। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন। দূর দূরান্ত হতে যখন পীড়িত ব্যক্তিকে তাদের স্বজনরা নিয়ে আসতো তখন তারা তার বাসায় খাওয়াদাওয়া করতো তারপর চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র ও ঔষুধ দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে গরীব রোগীদের তিনি বিনা মূল্যে ঔষুধ দিতেন। রোগীর দেওয়া ফিশ তাঁর কছে বড় ছিলনা, মূল্যবান ছিল রোগীর জীবন, রোগীকে বাঁচাতে হবে টাকার বিনিময়ে নয়, হৃদয়ের বিনিময়ে, চিকিৎসা ও সেবার মাধ্যমে। মানুষকে ভালোবাসার প্রবনতায় যে আত্মত্যাগ ও পবিত্রতা আছে, তা তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছিল। মানব প্রেম যদি কুসুম হয়, হবে কর্মকে তার রুপ ও সুবাস বলা যেতে পারে। তিনি জানতেন এ পথ পরিক্রমায় আছে সময়ের সিঁড়ি। মানুষের সেবার মাধ্যমেই তা অতিক্রম করা যেতে পারে। অবিচল নিষ্ঠা আর নিত্য কর্মময় জীবন ধারায় তিনি আর্ত-পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে জীবন্ত আশ্বাস ও আশা হতে পেরেছিলেন। এই ছিল তাঁর অন্তরের পরিচয় এবং চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি একজন চিকিৎসক হিসাবে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা নয়, তিনি একজন সু-চিকিৎসক, সমাজ দরদী ও বুদ্ধিজীবি ছিলেন। তৎকালীন সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় তাঁর বহু গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তদানিন্তন ইষ্ট বেঙ্গল মেডিকেল এসোসিয়েশন এর সহ সভাপতি, নিউ ব্যাংক এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, দৈনিক সত্যবার্তা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও দি সডান প্রিন্টিং প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজিয়েট হাইস্কুল, সরকারী মুসলীম হাইস্কুল, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের কার্য্যকরী সংসদের সদস্য, স্থানীয় কদম মুবারক এতিমখানার সম্পাদক, ইসলামাবাদ টাউন কোপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, চট্টগ্রাম পৌরসভার কমিশনার, মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের পরিচালনা কমিটির সদস্য, চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের পরিক্ষক মন্ডলীর সদস্য, কলকাতার দি মুসলিম পাবলিশিং কোং লিমিটেডের ডাইরেক্টর ছিলেন। এছাড়া কানাডার সান লাইফবীমা কোম্পানীর, বমেরবর জীবন বীমা কোম্পানী ইত্যাদির ও সে সময়কার বহু দেশী ও বিদেশী কোম্পানীর ডাক্তার ছিলেন। তৎকালীন মুসলিম লীগের (১৯৪৯ইং তে) বিখ্যাত সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে মুসলিম সাহিত্য ও বক্তৃতা পরিষদের সহযোগীতায় তিনি পাকিস্তানের রুপ ও রেখা সম্বলিত তথ্যবহুল একটি বই "পাকিস্তান" নামে ১৯৪২ ইং প্রকাশ করেন এবং সেটা সে সময়কার বই হিসাবে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থ "মানুষের ধর্ম ইসলাম"।

কিংবদন্তীর নায়ক এই স্বনাম ধন্য চিকিৎসক মাত্র বায়ান্ন বছর বয়সে ১৯৫১ ইং ৬ ই মার্চ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। চট্টগ্রামের ইতিহাসে তাঁর নাম চির নাম চির ভাস্কর হয়ে থাকবে এবং মানুষ আজও তাঁকে স্মরণ করে।

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২)

মুহাম্মদ এনামুল হক ২০ সেপ্টেম্বর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বখতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে History of Sufism in Bengal বিষয়ে গবেষণার জন্য তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বিটি ডিগ্রিও অর্জন করেছিলেন।

প্রধান শিক্ষক হিসাবে বেসরকারি স্কুলে চাকরি শুরু করেন, তিনি বিভিন্ন সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সরকারী কলেজে বাংলার অধ্যাপক, বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যক্ষ, বাংলা একাডেমীর পরিচালক, বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য, ঢাকা জাদুঘরের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও একুশে পদক লাভ করেন। মুহাম্মদ এনামুল হক প্রধানত গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ, আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য, (আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সঙ্গে যৌথভাবে) বঙ্গে সুফী প্রভাব, বাংলা ভাষার সংস্কার, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ব্যাকরণ মঞ্জুরী, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, মনীষা মঞ্জুষা, বুলগেরিয়া ভ্রমন ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর কিছু সম্পাদিত গ্রন্থ ও কিছু ইংরেজি গ্রন্থ রয়েছে। মুহাম্মদ এনামুল হক ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুর রহমান মাস্টার (১৯০২-১৯৭৭)

চট্টগ্রামের অন্তর্গত পটিয়া উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯০২ সালের মার্চ মাসে আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আশরাফ আলী এবং তাঁর মাতার নাম সুফিয়া বেগম। ১৯১৮ সালে পটিয়ার আব্দুস সোবহান রাহাত আলী হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উর্ত্তীণ হয়ে নিজের ও স্কুলের জন্য সম্মান বয়ে আনেন। স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে শিক্ষার বৃহত্তর অঙ্গনে তাঁর পদার্পণ ঘটে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে। এখান থেকে ১৯২০ সালে প্রথম বিভাগে আইএ এবং ১৯২২ সালে ইংরেজীতে অনার্স সহ দ্বিতীয় বিভাগে বিএ পাশ করেন।

এবার দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩ সালে তিনি ইংরেজীতে সেকেন্ড ক্লাস ফাষ্ট হয়ে এমএ উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৩০ সালে কৃতিত্বের সাথে বিটি পাশ করেন। ১৯৩১ সালের প্রারম্ভে বগুড়া জিলা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় ধরে রংপুর, পাবনা, চট্টগ্রাম, খুলনা ইত্যাদি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের পর চাকুরী জীবনের সমাপ্তি- লগ্নে তিনি বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। আপাদমস্তক একজন শিক্ষক আবদুর রহমান পেশাগত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে যেখানেই গিয়েছেন, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, উন্নত চারিত্রিকগুণ, সততা, মানুষের প্রীতি-ভালবাসার অনন্য উদাহারণ সৃষ্টি করেছেন। ১৯৫৮ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী সাহিত্য সম্মেলনের তিনি অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরীর সময় এ প্রদেশের শিক্ষার খাতে পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও তার বাস্তবায়নে অর্থ বরাদ্দের পরিমান ঠিক করার দায়িত্বে যে কমিটি গঠিত হয় জনাব আবদুর রহমান সে কমিটিতে অগ্রনী ভূমিকা রাখেন। এ কমিটিতে থাকাকালীন তিনি প্রায় হতাশা ব্যক্ত করতেন কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণে। ১৯৬০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান-এর গভর্ণর জে. আজম খান এর সময় এ্যাডভাইজারী কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। পটিয়াকে মহকুমা ঘোষনা করার প্রচেষ্টায় তিনি সফলকাম হন।

জনাব আবদুর রহমান চট্টগ্রাম (এমইএস) মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি কার্যক্রমের সাথে ওতোপ্রতো ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুদীর্ঘ ৩০ বছর ধরে তিনি পর্যায়ক্রমে সোসাইটির জয়েন্ট সেক্রেটারী, সেক্রেটারী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এমইএস কলেজ, এমইএস স্কুল ও এমইএস কিন্ডার গার্ডেন স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি চট্টগ্রাম মুসলিম ইনষ্টিটিউট বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরী ও তৎসংলগ্ন মসজিদ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। সাহিত্য-কর্মেও তাঁর প্রতিভা ছিল। তিনি রচনা করেন মাতৃভাষায় কোরান ও জীবন-দর্শন, আদর্শ ও সাধনা, স্মৃতিকণা, হাদিস সংকলন, কসিদায়ে গাউছিয়া, কাব্যে আমপারা, যতটুকু মনে পড়ে ইত্যাদি।

জনাব আবদুর রহমান ১৯৭৭ সালের ২০ শে জুলাই রাত ১০টা ৩০ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে আবদুর রহমান সড়কস্থ নিজস্ব বাসভবন 'ক্রিসেন্ট হাউস' এ ইন্তেকাল করেন।

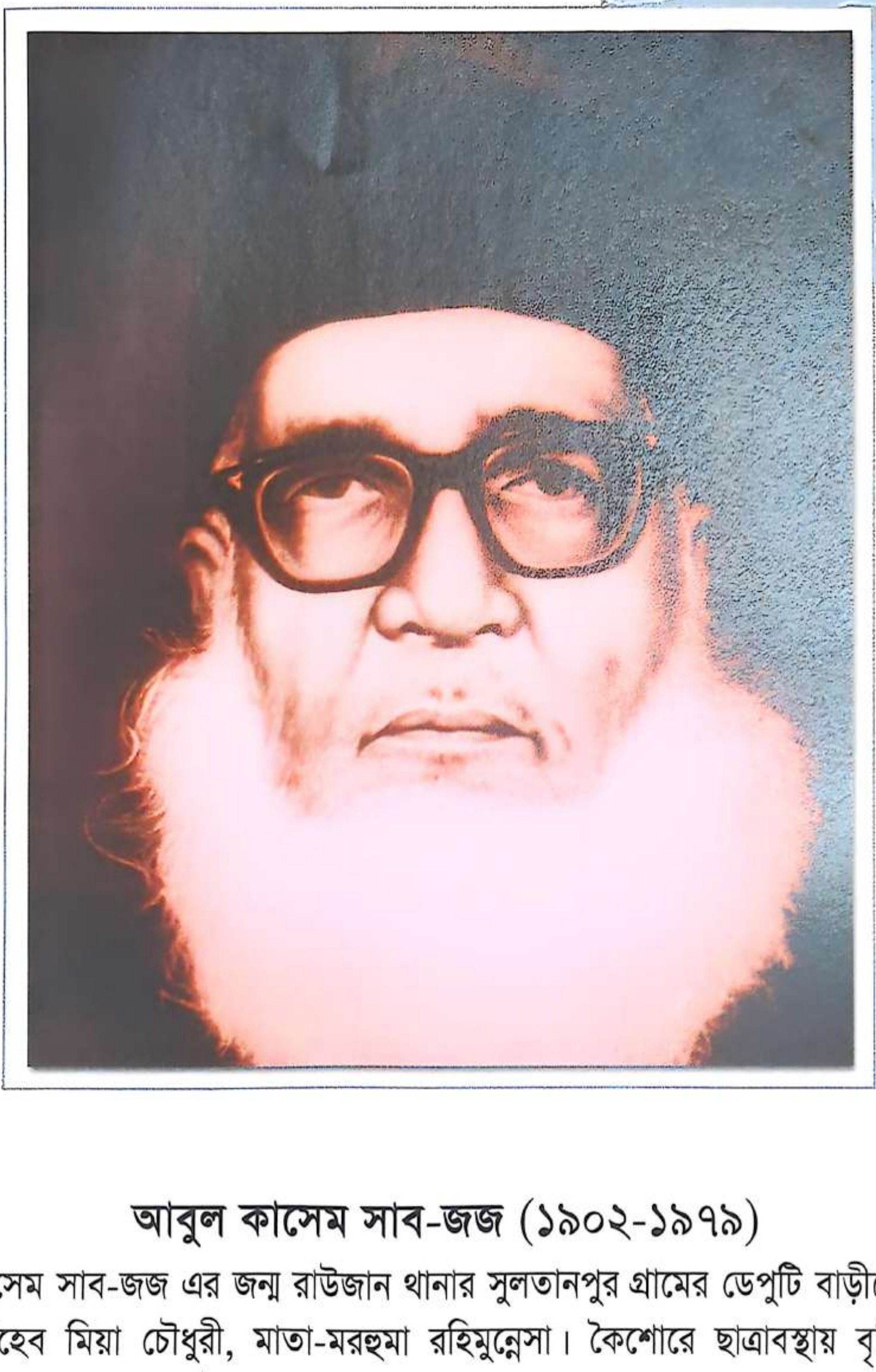

আবুল কাসেম সাব-জজ (১৯০২-১৯৭৯)

আবুল কাসেম সাব-জজ এর জন্ম রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামের ডেপুটি বাড়ীতে। পিতা-মরহুম সাহেব মিয়া চৌধুরী, মাতা-মরহুমা রহিমুন্নেসা। কৈশোরে ছাত্রাবস্থায় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের উন্মাতাল পর্যায়ে জনাব আবুল কাসেম তাতে যুক্ত হয়ে পড়েন। বেশ কিছুকাল কারান্তরালেও তাঁকে কাটাতে হয় এ কারণে। ১৯২৮ সালে আইনশাস্ত্রে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর চট্টগ্রাম আদালতে আইনপেশায় আত্মনিয়োগ করেন।

মাত্র চার বছরের মাথায় জনাব আবুল কাসেম যোগ দেন অবিভক্ত বাংলা বিচার বিভাগে। '৩২ থেকে '৫৪ এ বাইশ বছর একাদিক্রমে বিচার বিভাগের দায়িত্বেরত থাকাবস্থায় মুন্সেফ থেকে সাবজজ পদে উন্নীত হন তিনি।

'৫৪ সালে সাব-জজ পদ থেকে পদত্যাগ করে তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত হন, পাশাপাশি মুসলিম লীগের সাথে সম্পৃক্ত হন এবং নির্বাচনে রাউজান নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৫৮ সালের দিকে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে সরে আসেন এবং '৬০-পরবর্তী পর্যায়ে আইউববিরোধী তীব্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলাকালে গ্রেপ্তারকৃত ছাত্র-রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য বিনা পারিশ্রমিকে আইনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। '৬৪-তে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে তিনি সম্মিলিত বিরোধী দল বা 'কপ'-এর প্রার্থী নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইউব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মাদারে মিল্লাত মিস্ মোহাতরেমা ফাতেমা জিন্নাহ্‌র চট্টগ্রামে নির্বাচন পরিচালনাকারীদের অন্যতম জেলা আইনজীবি সমিতির সাবেক সভাপতি ব্যারিষ্টার সাইফুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে তিনি কাজ করেন। '৭১-এ মুক্তিসংগ্রামকালে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বর্বরতার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিলেন। অনেকের আশ্রয়দান, এমনকি নিরাপদে দেশত্যাগের ক্ষেত্রে যেমনি তিনি গোপন ভূমিকা পালন করে গেছেন, তেমনি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সতীর্থ অনেক আইনজীবি ও গ্রামবাসীদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষায় সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জনাব আবুল কাসেম সাব-জজ অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সিন্ডিকেটের সদস্য, কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন ছাড়াও '৭৩ থেকে '৭৪-এ সময়ে বেশ কিছু কালের জন্যে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেন। জেলা আইনজীবি সমিতির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন একটানা চার বছর '৭১ থেকে '৭৪।

সাহসী, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, সত্যনিষ্ঠ, সুবক্তা, স্নেহবৎসল জনাব আবুল কাসেম নিরতিশয় ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁর আচার-আচরণে বেশভূষায় তার বহিঃপ্রকাশ ছিলো। এই মানবতাবাদী মানুষটি ১৯৭৯ সালের ৩১শে জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

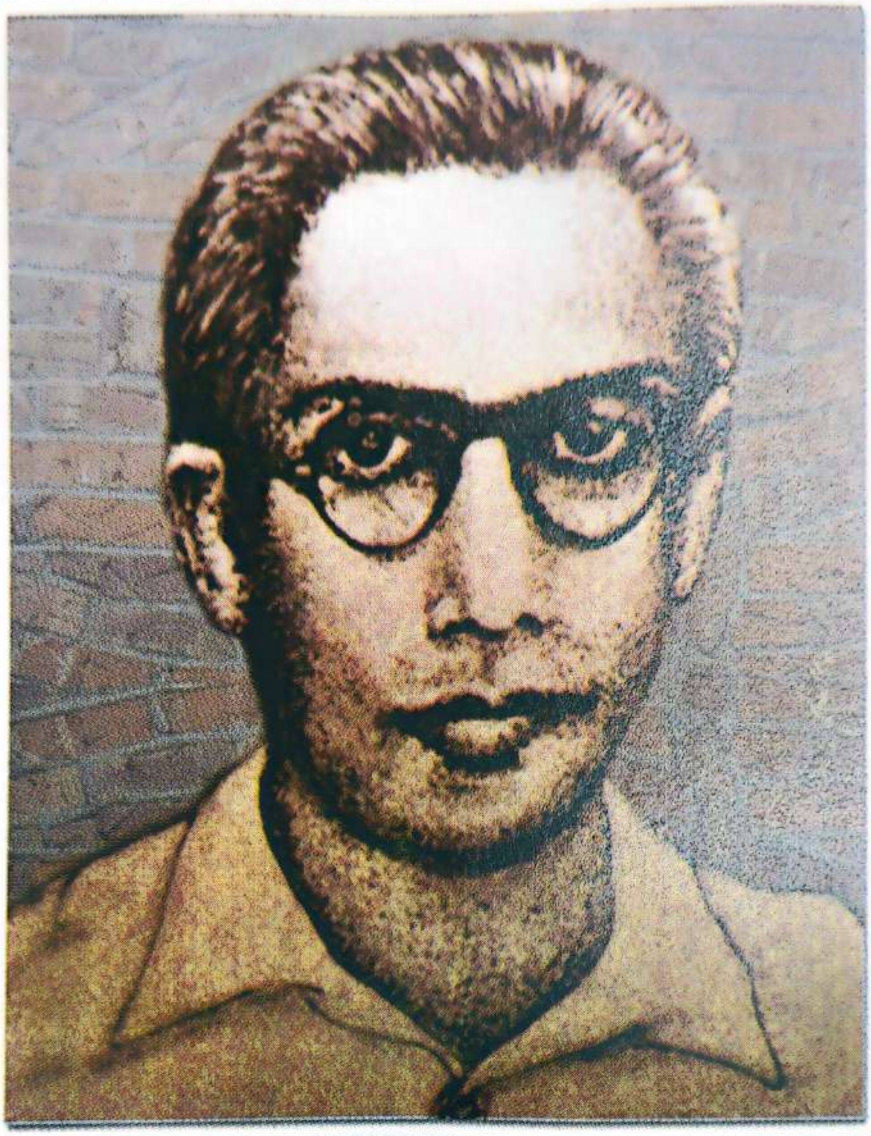

অনন্ত সিংহ (১৯০২-১৯৮০)

জন্ম: গোলাপ সিংহ লেন, চট্টগ্রাম। পিতা: গোলাপ চন্দ্র সিংহ। ছোট বেলা থেকেই সাহসী এবং দুরন্ত প্রকৃতির। রেলওয়ের টাকা ডাকাতিতে নেতৃত্ব। অস্ত্রাগার দখলে নেতৃত্ব। ফেনী সংঘর্ষে ৪ জন পুলিশ হত্যা।

১৯৩১-এর ৬ মে জেল ষড়যন্ত্র এবং ২ জুন ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাকারী। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় আন্দামানে জেল। ১৯৪৬-এ মুক্তির পর কোলকাতায় বসবাস, কিংবদন্তীর পুরুষ। নকসাল আন্দোলনের নেপথ্যে নেতা। ইন্দিরা-শাসন আমলে আত্মসমর্পণ ও মুক্তি। দরিদ্র ও নিপীড়িত জনতার জন্য তাঁর লড়াই আমৃত্যু। ধনীর অর্থ ছিনিয়ে দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে কেউ বলেছে 'বিপ্লবী', কেউ 'ডাকাত।'

ওবায়দুর রহমান নিজাম (ও আর নিজাম) (১৯০২ - ১৯৭০)

জনাব ওবায়দুর রহমান নিজাম ১৯০২ সালে ১লা জুলাই আনোয়ারা থানার তৈলারদ্বীপ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজে লেখাপড়া করেন। এবং ১৯২৬ সালে কর্পোরেট একাউন্টেন্ট হিসাবে গ্লাক্সোতে চাকরী জীবন শুরু করেন। তিনি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে তৎকালীন নামকরা কোম্পানী ফার-ইষ্ট-এ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

ঐ সময় তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। জনকল্যাণকর সমিতি, নার্সিং হোম, হাসপাতাল, ওল্ড ম্যান্‌স হোম, এতিমখানা, কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন। তিনি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালটি এবং ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্পেশাল পুলিশ অফিসার হিসাবে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তখন তিনি সিভিল ডিফেন্সের প্রধান ছিলেন।

১৯৪৮ সালে পাকিস্থানে চলে আসেন। তিনি তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংক-এর ডাইরেক্টর ছিলেন। টার্নার গ্রাহম্‌স অব ইষ্ট পাকিস্তান লিমিটেড, ইর্ষ্টান মেরিয়েন্টিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, রবিনসন্‌স ফুড্‌স (পাকিস্তান) লিমিটেড, সিএস লিমিটেড, ওরিয়েন্ট বেকারী এন্ড বিস্কুট ইন্ডাস্ট্রী লিমিটেড এবং ইষ্টার্ন এডভারটাইজিং লিমিটেড এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি নিউ জুবলী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, চিটাগাং বোর্ড মিল্‌স লিমিটেড ইত্যাদি সহ প্রায় একান্নটি সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে চট্টগ্রামবাসী তথা মানবতার সেবা করে যান। তিনি ১৯৭০ সালে ২৮শে মে মৃত্যুবরণ করেন।

সোলেমান চৌধুরী (১৯০৩-১৯৬৩)

জনাব মুহাম্মদ সোলেমান চৌধুরী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত চান্দগাঁও গ্রামের প্রখ্যাত চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে কলিকাতা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য শ্রেষ্ঠতম স্থান। ৭০ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোডে (বর্তমানে রবীন্দ্র স্মরনী) কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং স্বল্প সময়ে উন্নতি লাভ করেন। তিনি দুই বৎসরের মধ্যে মাদ্রাজ ও নাগপুরে এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রাম রেঙ্গুন ও আকিয়াবে তাঁর ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। সততা ও নিষ্ঠাগুণে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। ১৯৪৪ সালে তিনি খাতুনগঞ্জ আমির মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন বন্ধুত্বপরায়ন।

তৎকালীন জাতীয় পরিষদের স্পীকার জনাব এ,কে,এম ফজলুল কাদের চৌধুরী ও গভর্ণর জাকির হোসেন সোলেমান চৌধরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সোলেমান চৌধুরী নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছেন। তিনি নিজ গ্রামে নাসির মোহাম্মদ চৌধুরী মডেল হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে এন.এম.সি. স্কুল নামে প্রসিদ্ধ। তথাপি দেশের গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এবং ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে তাঁর আর্থিক সহযোগীতা যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সোলেমান চৌধুরী অত্যন্ত ধর্মভীরু ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকার সাথে সাথে তিনি অনেক মাজার শরীফ সংস্কারসহ মসজিদ, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি নির্মাণ করেন। সোলেমান চৌধুরীর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়েছে জনসেবা মূলক কর্মকান্ডে। তিনি নিজ গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে তার নাম রাখেন বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর নামানুসারে। বহদ্দারহাট থেকে চান্দগাঁও পর্যন্ত তিনি যে দু'মাইল সড়ক পাকা করে দিয়েছেন, তা হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তি (রাঃ) এর নামানুসারে। এছাড়া তিনি সাতকানিয়ায় দুটি পুল নির্মাণ, ধুমের দরগাহ্ চিনকি মস্তানের দীঘিটি' খনন করে দেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (রাহঃ)'র দরগাহের সংস্কার, সিঁড়ি ও মোসাফির খানা স্থাপন। দান অব্যাহত রাখার জন্য দেশব্যাপী সুপরিচিত ছিলেন। সোলেমান চৌধুরী তাঁর অকৃত্রিম বদান্যতার জন্য দেশব্যাপী সুপরিচিত ছিলেন। সোলেমান চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রামের একজন খ্যাতনামা সমাজকর্মী। তিনি পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি ও মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি মুসলিম ইনস্টিটিউটের সদস্য, পাকিস্তান কো-অপারেটিভ সোসাইটির ডাইরেক্টর, চট্টগ্রামস্থ্ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (১৯৫৪-৫৮) পোর্ট কমিশনার (১৯৫৪-৫৮) পোর্ট কমিশনার (১৯৫৭-৬৮) প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত থেকে আজীবন দেশ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

এছাড়া তিনি চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাইস্কুল, সরকারী কমার্স কলেজ, খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম মহিলা কলেজের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন। তাছাড়া তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের শিল্প সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর এই বহু অবদানের স্বিকৃতি স্বরূপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নগরীর কাপাসগোলা থেকে বহদ্দারহাট পর্যন্ত সড়কটি 'মোহাম্মদ সোলেমান চৌধুরী সড়ক' নামে নামকরণ করা হয়।

এ ক্ষণজন্মা মহৎ ব্যক্তি ১৯৬৩ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঈদের দিন দিবাগত রাতে ৬০ বৎসর বয়সে সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে খোদার সান্নিধ্যে গমন করেন।

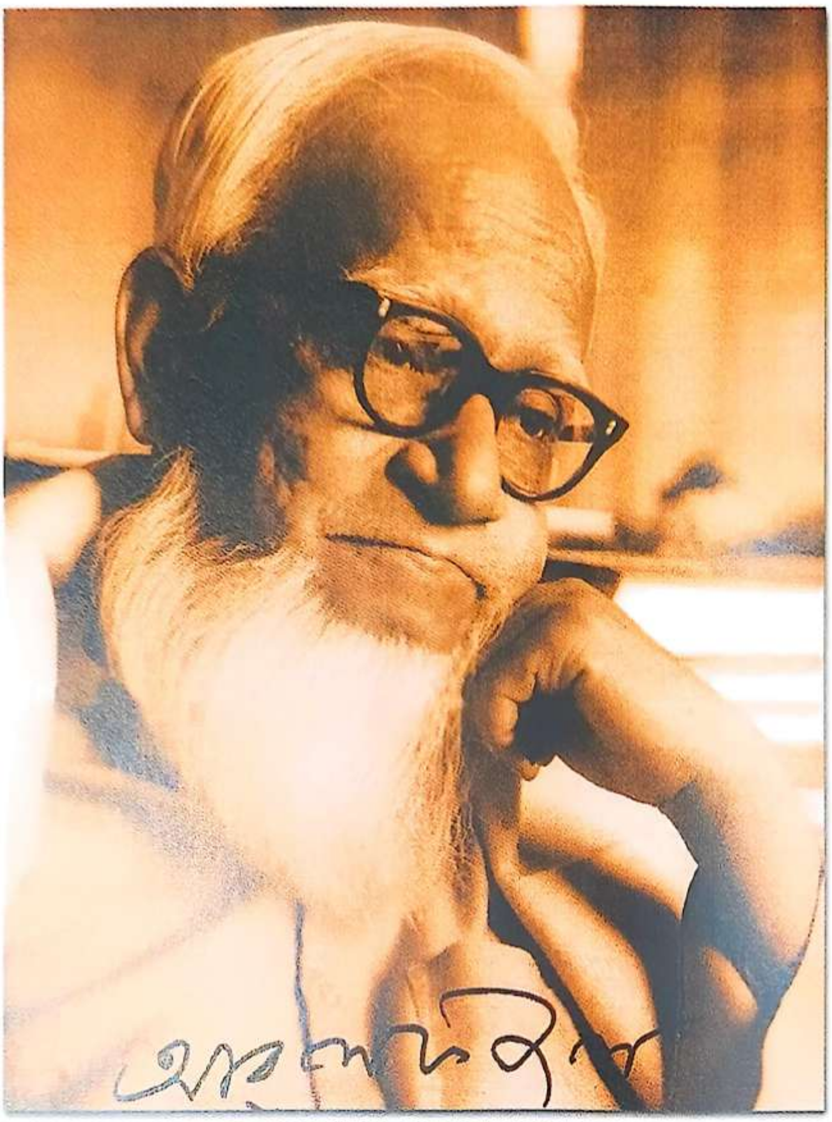

অধ্যাপক আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)

আবুল ফজল ১লা জুলাই ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার কেওচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া শেষে তিনি প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে সরকারি কলেজে দীর্ঘদিন বাংলা বিষয়ে অধ্যাপনা করেন।

তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং রাষ্ট্রপতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে আবুল ফজল প্রথমে উপন্যাস লিখে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও তিনি মূলতঃ একজন চিন্তাশীল ও সমাজমনস্ক প্রবন্ধকার।

তাঁর প্রবন্ধে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সর্ম্পকে গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - জীবন পথের যাত্রী, রাঙা প্রভাব, চৌচির, মাটির পৃথিবী, আয়েশা, আবুল ফজলের শ্রেষ্ট গল্প; সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, সমাজ সাহিত্যে রাষ্ট্র, শুভবুদ্ধি, সমকালীন চিন্তা, রেখাচিত্র, সফরনামা, দুর্দিনের দিনলিপি ইত্যাদি। আবুল ফজল ১৯৮৩ সালের ৪ঠা মে মৃত্যুবরণ করেন।

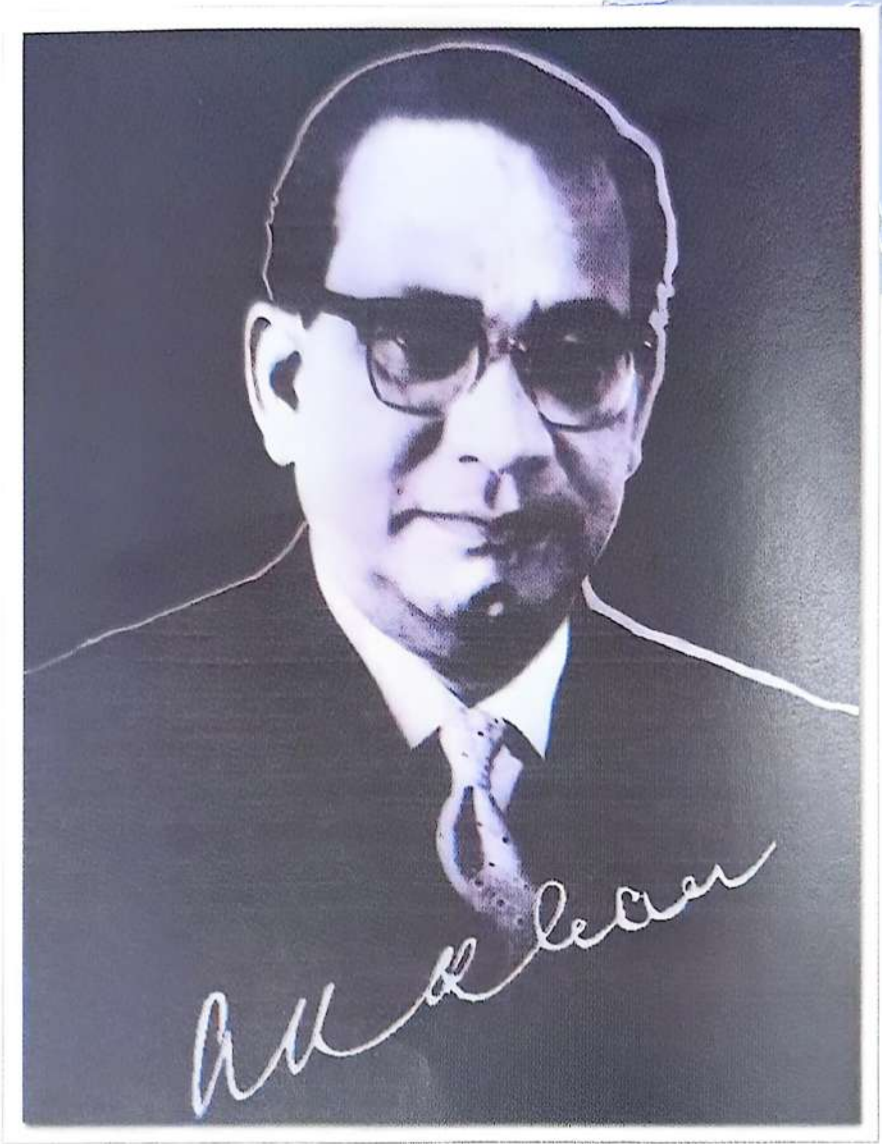

এ কে খান (১৯০৫-১৯৯১)

আবুল কাশেম খান ১৯০৫ সালে বন্দর-নগরী চট্টগ্রামের অদূরে মোহরা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে ১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল জ্যুডিসিয়াল সার্ভিসের অধীনে সরকারী চাকুরী করেন। ১৯৪৩ সালে চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন।

১৯৩৩ সালে অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আয়ূব খানের প্রথম মন্ত্রী সভার শিল্প মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও যৌথ উদ্যোগে তিনি এ দেশে বহু শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় অর্থনীতিতে অসাধারণ অবদান রাখেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধেও তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। তিনি একেখান ফাউন্ডেশন করে তাঁর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর ৩০ শতাংশ লভ্যাংশ জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ধর্মের সেবায় দান করে গেছেন।

এ কে খান এ দেশের রাজনীতি ও শিল্প-বাণিজ্যের অঙ্গনে একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর নীতি ও নিয়ম-বোধ, সমাজ-সচেতনতা, জ্ঞান-চর্চা, সমাজসেবা, সফল শিল্প উদ্যোক্তাসহ অনেক অনুসরণীয় গুণাবলীর দৃষ্টান্ত রেখে ১৯৯১ সালের ১লা এপ্রিল ইন্তেকাল করেন।

গণেশ ঘোষ (১৯০৫-১৯৯৩)

জন্মস্থান যশোরের মাগুরায়। পিতা: বিপিন বিহারী ঘোষ, চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়ে বিপ্লবী দলে যোগদান। ১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠক। জালালাবাদ যুদ্ধের সেনাপতি। ১৯৩০ সালের ২ সেপ্টেম্বর চন্দননগর আশ্রয় ঘাঁটি থেকে গ্রেপ্তার। বিচারে দ্বীপান্তর। ১৯৪৬ সালে মুক্তির পর কমিউনিষ্ট দলে যোগদান।

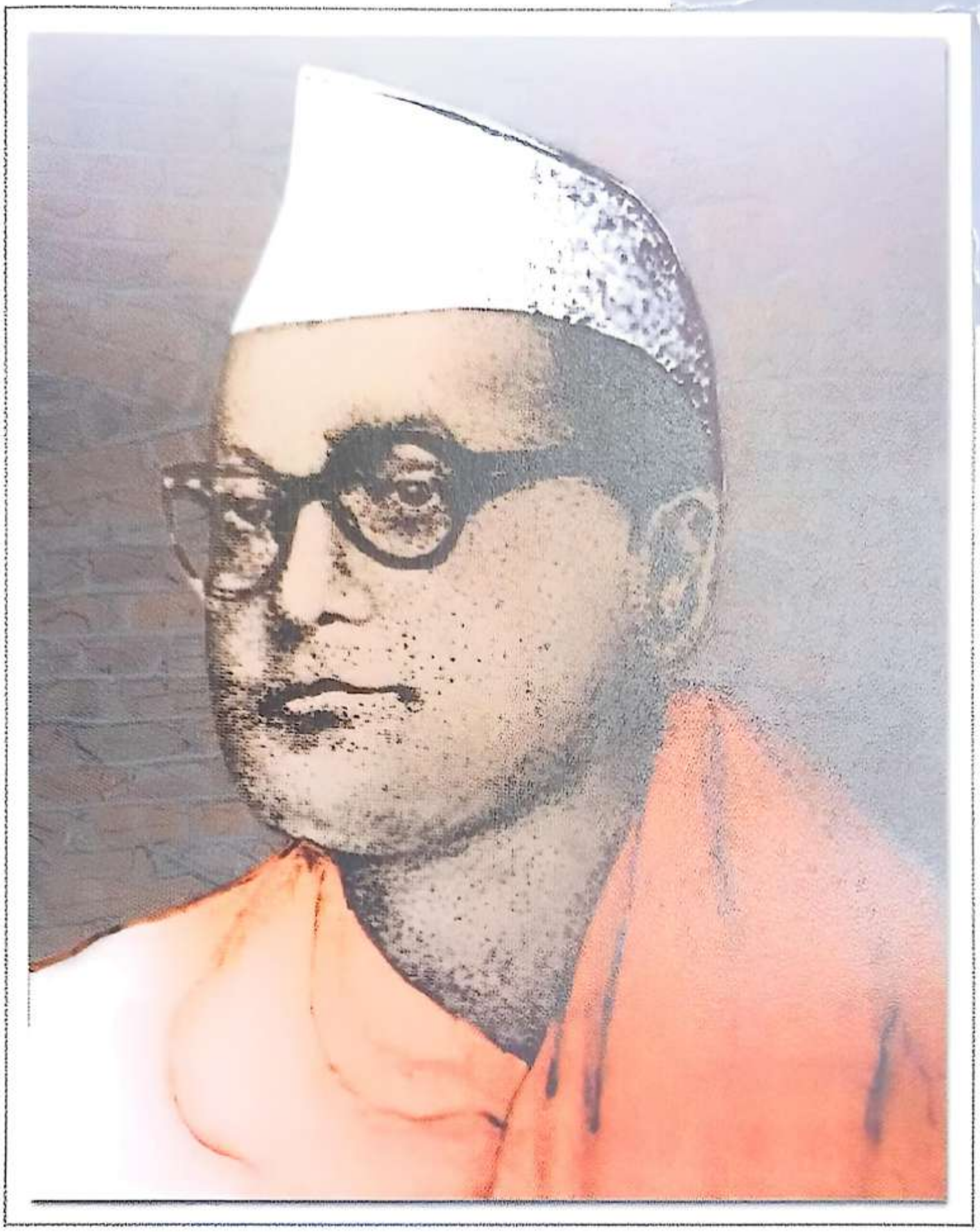

লোকনাথ বল (১৯০৭-১৯৬৪)

বোয়ালখালী থানার ধোরলা গ্রামে জন্ম। পিতা প্রাণকৃষ্ণ বল। ছোটবেলা থেকেই ব্যায়ামবীর, অস্ত্র চালনায় দক্ষ। দামপাড়া পুলিশ ব্যারাক দখল ও পাহাড়তলী অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র দখলে নেতৃত্ব দান। জালালাবাদ যুদ্ধের সেনাধ্যক্ষ। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় দ্বীপান্তর। ১৯৪৬-এ মুক্তি পেয়ে মানবতাবাদী দলে যোগদান।

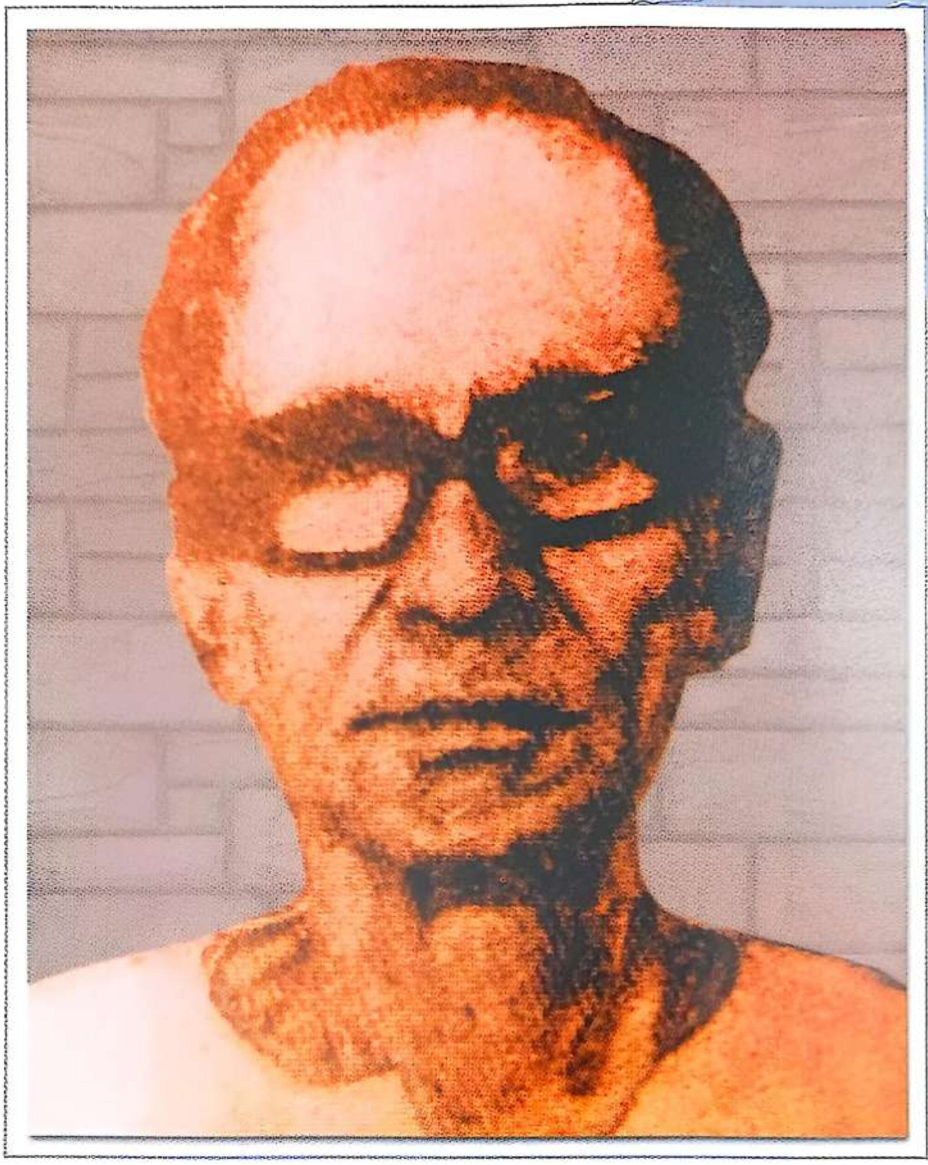

বিনোদ বিহারী দত্ত (পরিদা)

১৯০৮ সালে পটিয়া থানার মটপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা দীনবন্ধু দত্ত। বিপ্লবী দলের সংগঠক। মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির পর দলের নেতা। আত্মগোপনে থেকে অভিযান পরিচালনা। ১৯৪১ সালে ধৃত, ৭ বৎসর কারাভোগ।

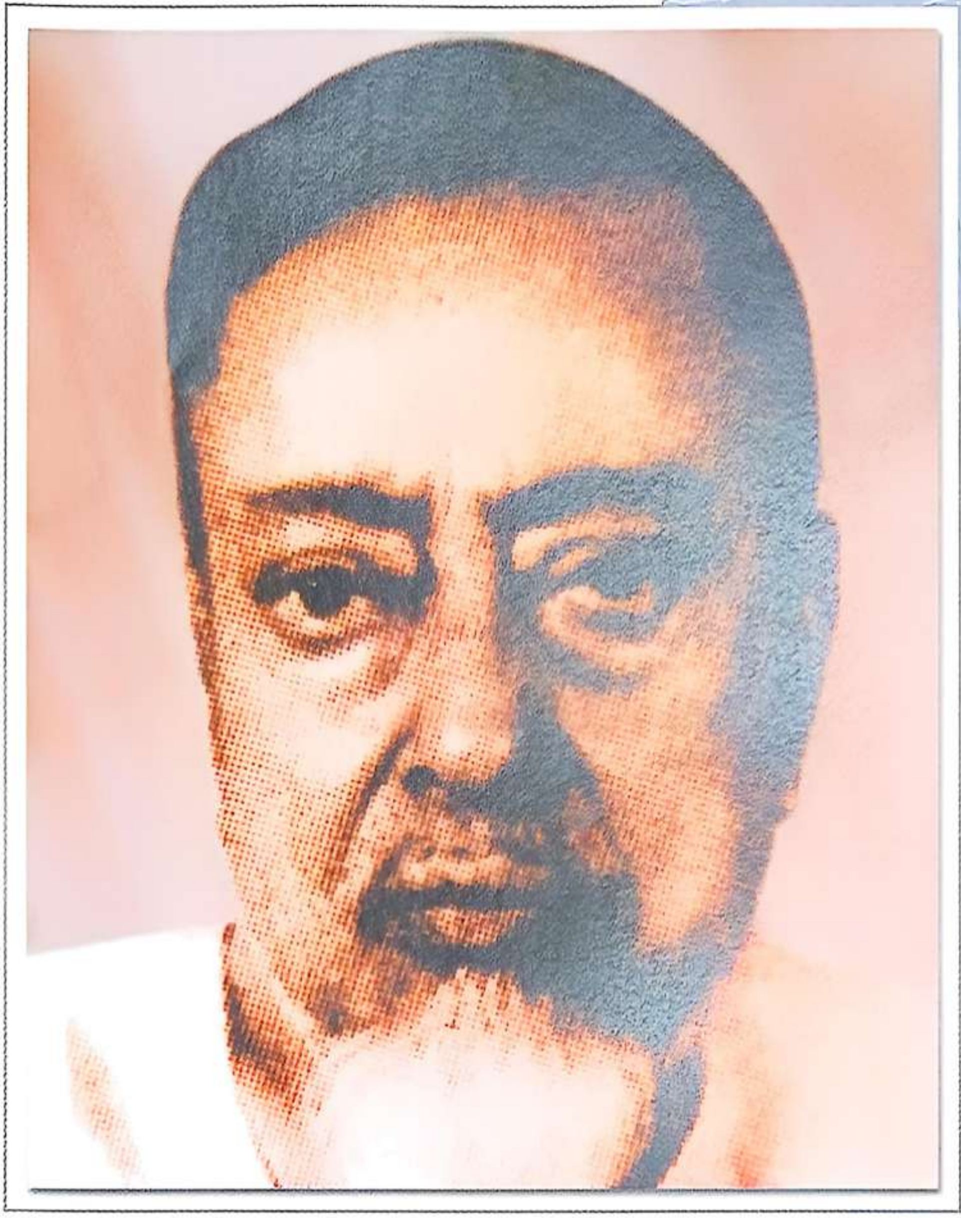

আলহাজ্ব মাহমুদুন্নবী চৌধুরী (১৯০৯-১৯৯৫)

আলহাজ্ব নবী চৌধুরী ১৯০৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার উত্তর কাট্টলীতে সম্ভ্রান্ত নাজির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কলকাতায় গিয়ে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন এবং দেশ বিভাগের পর চট্টগ্রাম চলে আসেন। তিনি চট্টগ্রাম পৌর সভার কমিশনার এবং ১৯৬২-৬৩ সনে চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে তিনি সীতাকুণ্ড ও ডবলমুরিং থেকে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ৬ আগস্ট ১৯৯৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

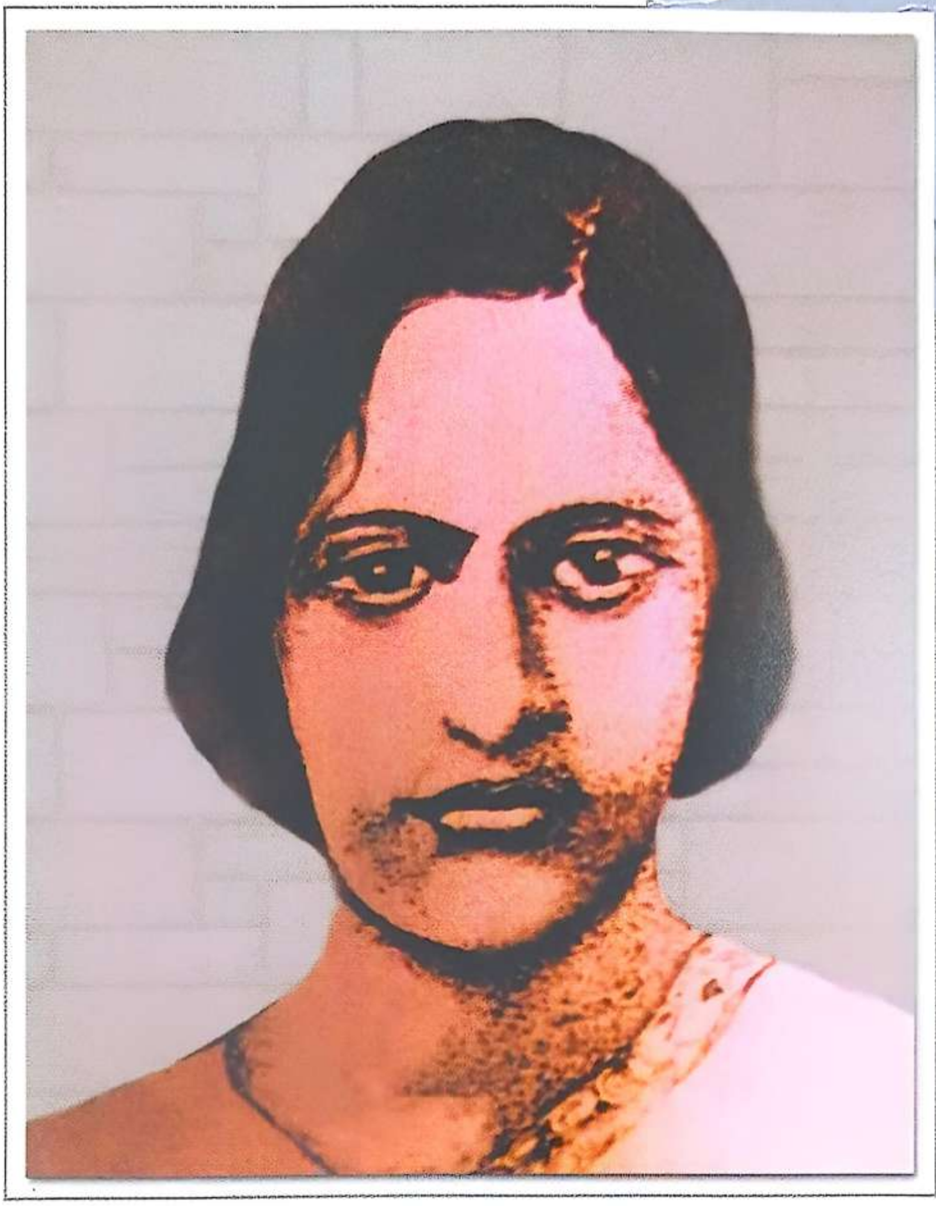

প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার (১৯০৯-১৯৩২)

জন্ম চট্টগ্রামে। পিতা: জগৎবন্ধু, মাতা: প্রতিভাময়ী। প্রবেশিকা খাস্তগীর স্কুল, আইএ ঢাকার ইডেন, স্নাতক কলিকাতার বেথুন। ইডেনে পড়ার সময় বিপ্লবী দলে যুক্ত। ১৯৩২ সালে ধলঘাট ঘাঁটিতে মাস্টারদার সাথে সাক্ষাৎ। সেখানে সেনাবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ, সেনাব্যূহ ভেঙ্গে মাস্টারদাসহ বেরিয়ে আসতে সমর্থ। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব, আততায়ীর গুলিতে আহত, ধরা পড়ার আশংকায় আত্মাহুতি।

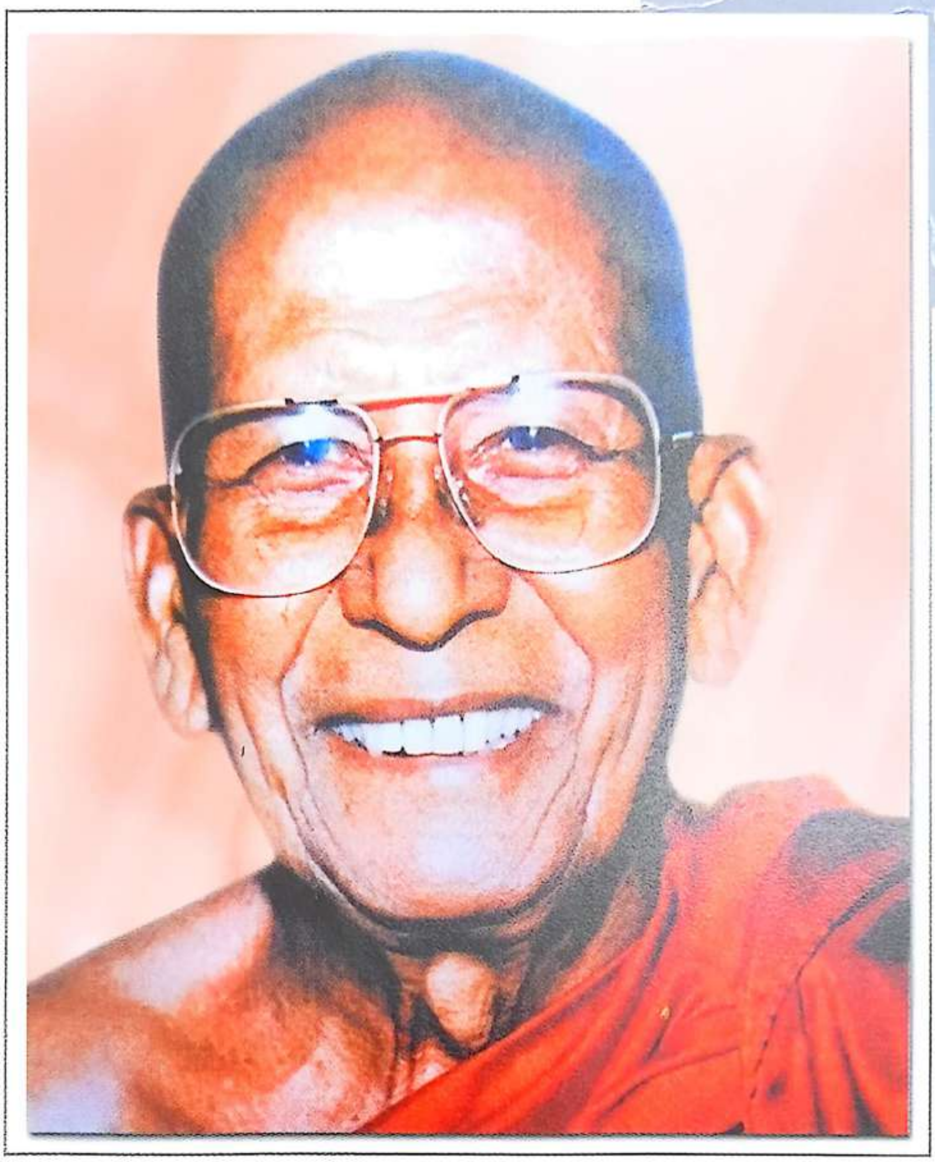

বিশুদ্ধানন্দ মহাথের (১৯০৯-১৯৯৪)

বিশুদ্ধানন্দ মহাথের ১৯০৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় কর্মধন বড়ুয়া মাতা স্বর্গীয় চিন্তাবতী বড়ুয়া। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১৯২৫ সালে পিতৃব্য অগ্রসারের উপাধ্যায়ত্বে 'প্রবজ্যাা' ধর্মে দীক্ষিত হলেন - নাম রাখা হল-শ্রামণের বিশুদ্ধানন্দ। তিনি বাংলার ভিক্ষু সংঘের প্রতিনিধি হয়ে সর্বভারতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সে বছর কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত ও নেতাজী সুভাষ বসুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন।

এ সময় তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নি পুরুষ, চট্টগ্রামের বিপ্লবী সন্তান মাষ্টারদা সূর্যসেনের সংগে এদেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁদের অকৃত্রিম দেশপ্রেমবোধ ও স্বদেশ প্রীতি পরবর্তীকালে প্রয়াত মহাথেরর জীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৩০ সালে স্বীয় গুরুষ উপাধ্যাত্বে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভারতের বেনারস গমন করেন। বিদ্যার্জন করার পর উচ্চশিক্ষা লাভের সেখান থেকে শ্রীলংকায় গমন করেন। শ্রীলংকায় বিদ্যালংকার বিশ্ববিদ্যালয় হতে "শ্রী সদ্ধমভানক" উপাধি লাভ করে স্বদেশে মদ্ধম প্রসারের জন্য প্রত্যাবর্তন করেন। স্বগ্রামে এসেই তিনি ধর্ম ও কর্মের প্রসারের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৯ সালে সুদর্শন বিহারে পালি শিক্ষার জন্য 'অগ্রসার পালি কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ১৯৪৩ সালের নিদারুন দুর্ভিক্ষ পীড়িত সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও পালনের জন্য বৌদ্ধ অনাথালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৪ সালে জনকল্যাণকর মানসে পুরুষ নামানুসারে "অগ্রসার স্মৃতি সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। এ ভাবে কর্মময় জীবনের ব্যাপক ভিত্তি রচনা করে ১৯৪৯ সালে তদানীন্তন সমাজের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন-যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ নামে দেশ বিদেশে খ্যাতি অর্জন করে। প্রয়াত মহাসংঘনায়ক মহোদয় এই সংগঠনের মাধ্যমে বৌদ্ধ জাতি ও শাসনের উন্নতিকল্পে আত্ম নিয়োগ করেন এবং আমৃত্যু এই সংগঠনের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫০ সালে এই সংগঠনের প্রতিনিধি হয়ে তিনি বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে ডব্লিউ এফ বিতে যোগদান করে এদেশের বৌদ্ধ জনসাধারণকে বিশ্ব বৌদ্ধদের পরিচিত করে এক অবিস্মরণীয় যোগসূত্র রচনা করেন। তাঁর কর্ম প্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল। একের পর এক তিনি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে সমস্ত কর্ম কান্ডে এক নতুন প্রেরণা ও সঞ্জীবনী শক্তি সৃষ্টি করে চললেন।

রাজধানী ঢাকায় বৌদ্ধদের জন্য একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ তাঁর অনলস শ্রম, ত্যাগ ও ঐকান্তিকতার ফসল। বর্তমানে "ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার" নামে সুপরিচিত। এই ধর্মীয় সাধক ১৯৯৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ২০০৫ সালে তিনি সমাজ সেবার জন্য মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন।

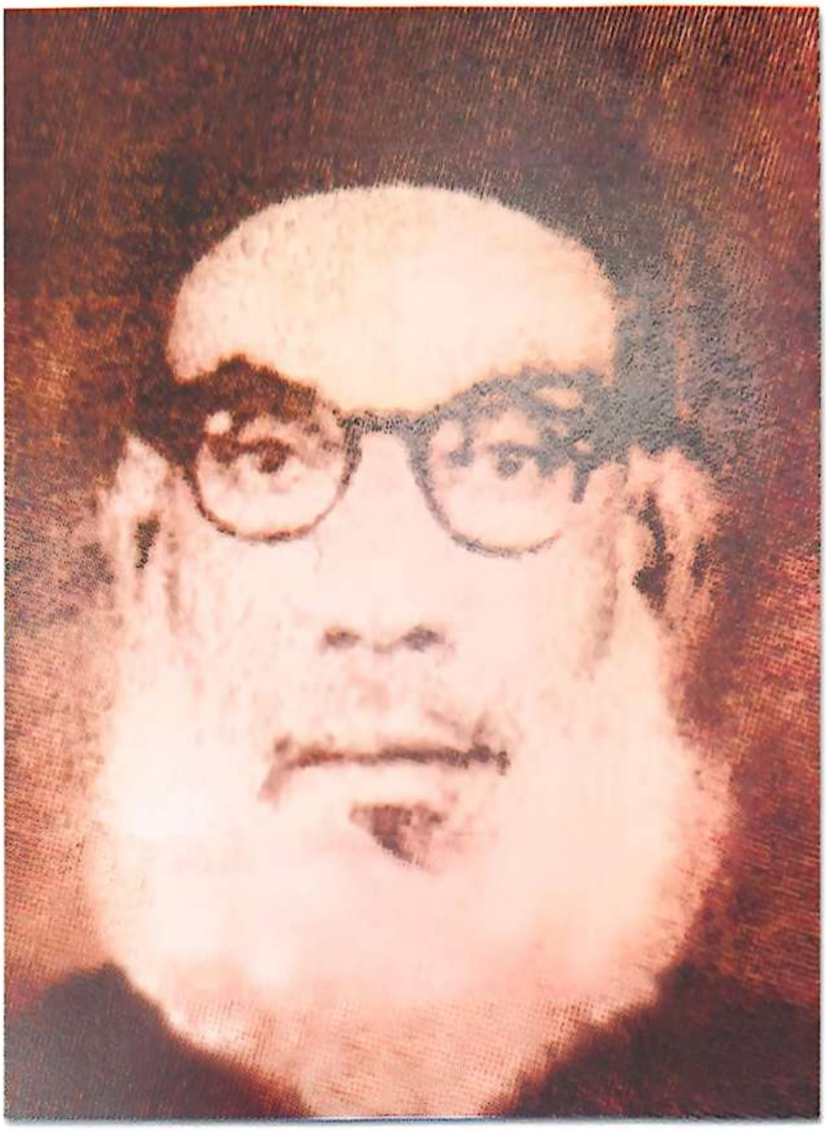

ড. সানাউল্লাহ্ ব্যারিষ্টার (১৯১০-১৯৬৩)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পহেলা মার্চ ১৯১০ সালে ড. সানাউল্লাহ্ ব্যারিষ্টার চট্টগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৭ সালে মাধ্যমিক এবং ১৯২৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০ টাকা বৃত্তি সহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯৩১ সালে কলকাতার বিখ্যাত প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ২০ টাকা বৃত্তিসহ প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৩৪ সালে রেকর্ড-পরিমাণ নম্বর সহ বার-এট-ল পাশ করেন। ১৯৩৫ সালে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে আরবীয় ইতিহাসের উপর গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক আইসিএস (Indian Civil Service) পরীক্ষায় দুবার উত্তীর্ণ হন।

তিনি ১২ বৎসর কলকাতা হাইকোর্ট-এ আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ৮ বৎসর বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ৮ বছর কাল যাবৎ চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরীক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট (সিন্ডিকেট)-এর সদস্য ছিলেন কলকাতাস্থ চট্টগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালন সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করে সমাজসেবা করে গেছেন। অন্য দিকে তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন ও উঁচুদরের আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। তিনি ১৯৬৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

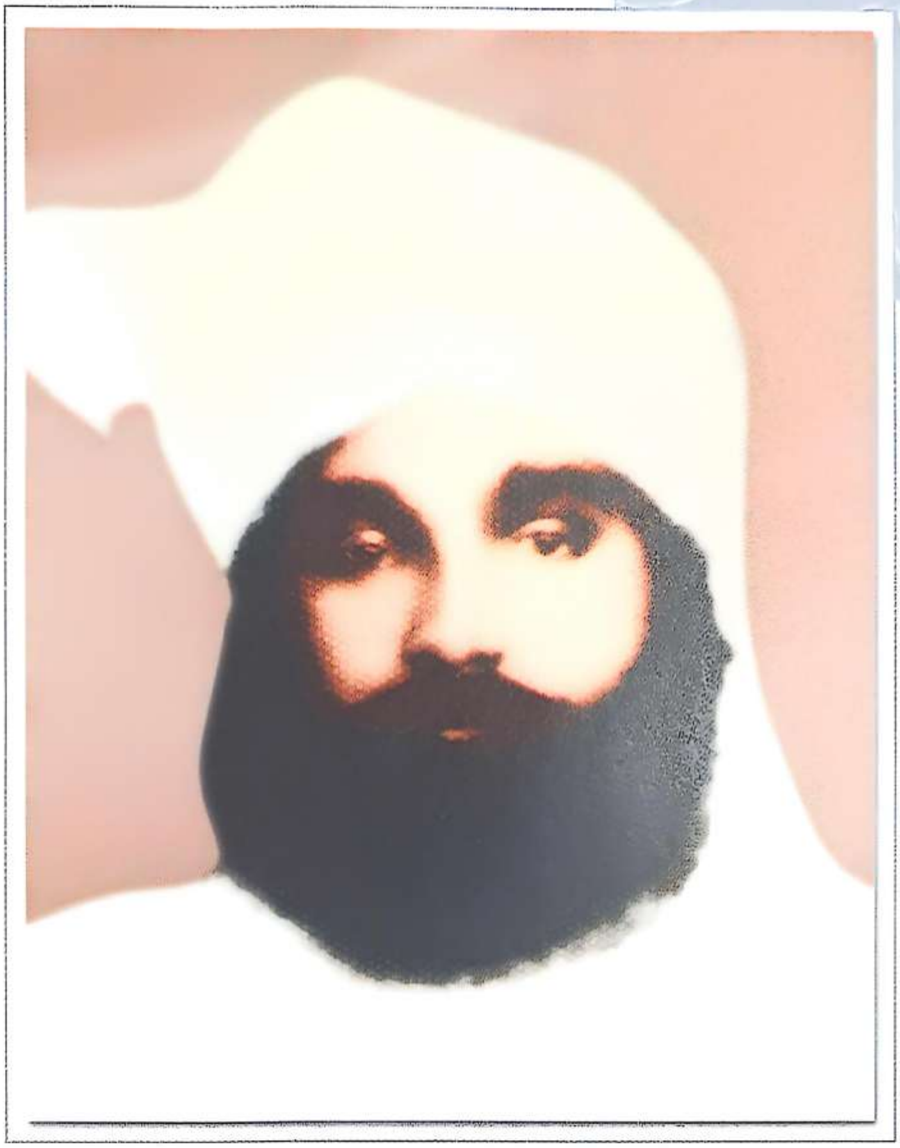

মোহাম্মদ লোকমান খান শিরওয়ানী (১৯১০-১৯৬৯)

১৯১০ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবী, সাংবাদিক ও কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর অনুসারী এই রাজনৈতিক কর্মী ইংরেজ সরকার কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক চিঠিতে' জানা যায় শিরওয়ানীর রচনাদি আবু সয়ীদ আইয়ুর ও সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখের মনোযোগ লাভ করেছিলেন।

প্রায় সাত ফুট দীর্ঘদেহী শিরওয়ানী সুভাষ বসুর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-হীরক জয়ন্তী উৎসবে স্বেচ্ছা-সেবক দলের কমান্ডার ছিলেন লোকমান খান। তিনি দৈনিক 'সোলতান' ও দৈনিক 'আমির' পত্রিকার চট্টগ্রামস্থ সংবাদদাতা, দৈনিক রাষ্ট্রবার্তা'র সম্পাদক, সাপ্তাহিক 'অধিকার'-এর সভাপতি, দৈনিক 'প্রত্যহ'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, সাপ্তাহিক 'নয়াবাংলা'র সহযোগী সম্পাদক, মাসিক 'সাম্যবাদী'র সম্পাদক, দৈনিক 'নবযুগ' ও দৈনিক 'কৃষক' -এর পরিচালনা-বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

লোকমান শিরওয়ানী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি নিখিল ফরওয়ার্ড ব্লক ওয়াকিং কমিটির সভ্য ও শরৎ বসুর গণসমাজতন্ত্রী পার্টির যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। তাছাড়া শিরওয়ানী সাহেব সারা ভারত কিষাণ সভার কার্যকরী পরিষদের সভ্য, বঙ্গীয় কিষাণ সভার সভাপতিমন্ডলীর সদস্য, নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির সহ- সভাপতি, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি পদে ব্রত ছিলেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বঙ্গীয় সংকট ত্রাণ সমিতির সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বেই ঢাকায় কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিধ্বস্ত বঙ্গদেশ ও তার আশে পাশে যে সব ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছিল লোকমান খান শিরওয়ানী সে সময় তার নেতৃত্বে সংগঠিত ওসব মানবিক সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে দুর্গত মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

তাঁর কর্মকান্ডের উপর সন্তুষ্ট হয়ে ১৯৩৫ সালের ১৫ই অক্টোবর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চট্টগ্রামের পাঠানটুলির ঠিকানায় চিঠি লিখেন স্বাধীনতার জন্য হিন্দু মুসলমান একসাথে কাজ করার জন্যে। তিনি দেশ বিভাগের পরে ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হচ্ছে : বিদ্রোহী আরব (উপন্যাস), রূপায়তন গল্প, রক্ষক ভক্ষক হলে, দামামা (কাব্য) শবনম (কাব্য) সহ অনেক রাজনৈতিক প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। এই সমাজসেবক, রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক, মানবদরদী মহৎ মানুষটি ১৯৬৯ সালে চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

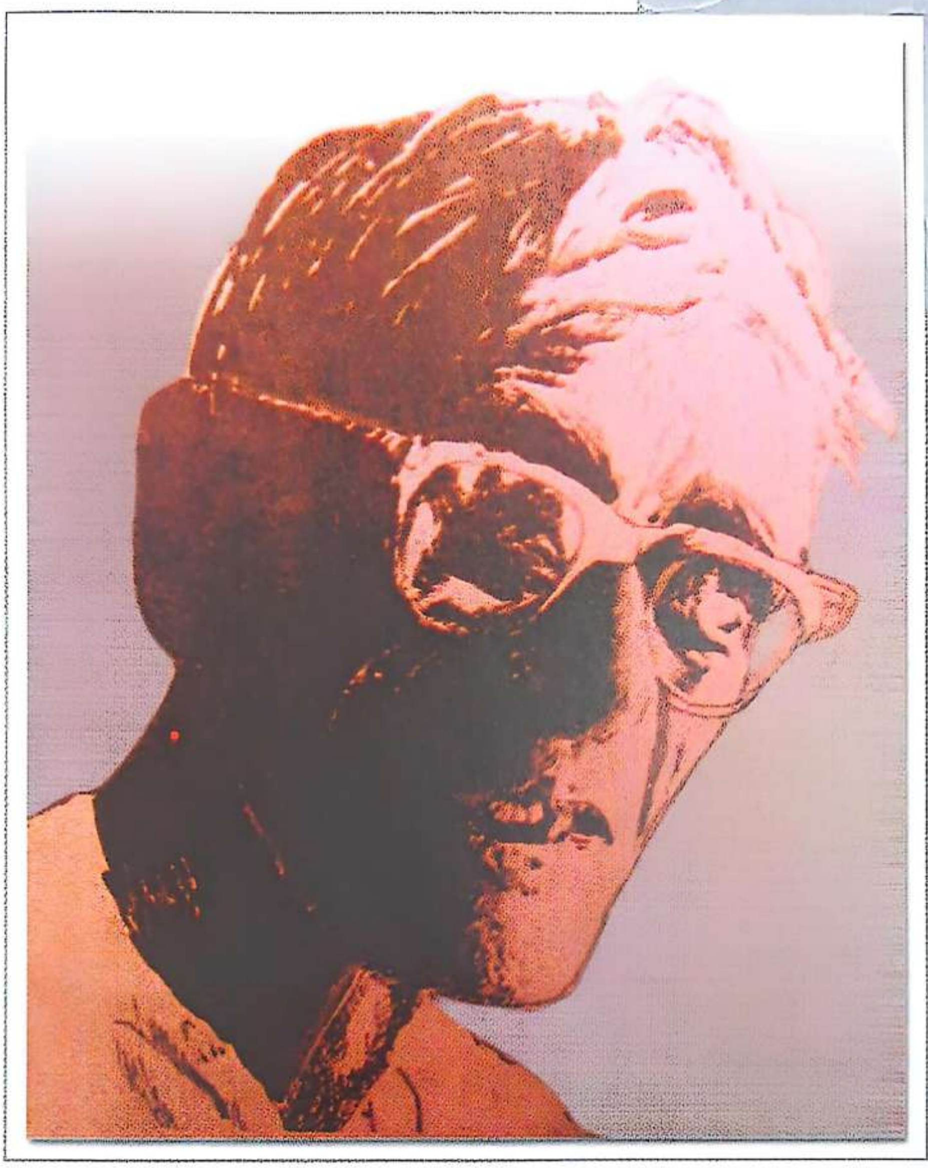

কালীপদ চক্রবর্তী (১৯১০-১৯৯০)

বোয়ালখালী থানার পোপাদিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা শ্যামাচরণ স্মৃতিতীর্থ। ১৮ বৎসর বয়সে মাস্টরদার সাথে সাক্ষাৎ। মাস্টারদার আকর্ষণী শক্তি তাঁকে বিপ্লবী করে তোলে। দলের সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র গোপন স্থানে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত। টেলিফোন ভবন আক্রমণ ও জালালাবাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ। ১৯৩০ সালের ১ ডিসেম্বর চাঁদপুরে রেলগাড়িতে পুলিশ অফিসার তারিণী মুখার্জি হত্যার অপরাধে দ্বীপান্তর। ১৯৪৬-এ মুক্তির পর কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান। পাকিস্তান আমলে ১২ বৎসর কারাবাস।

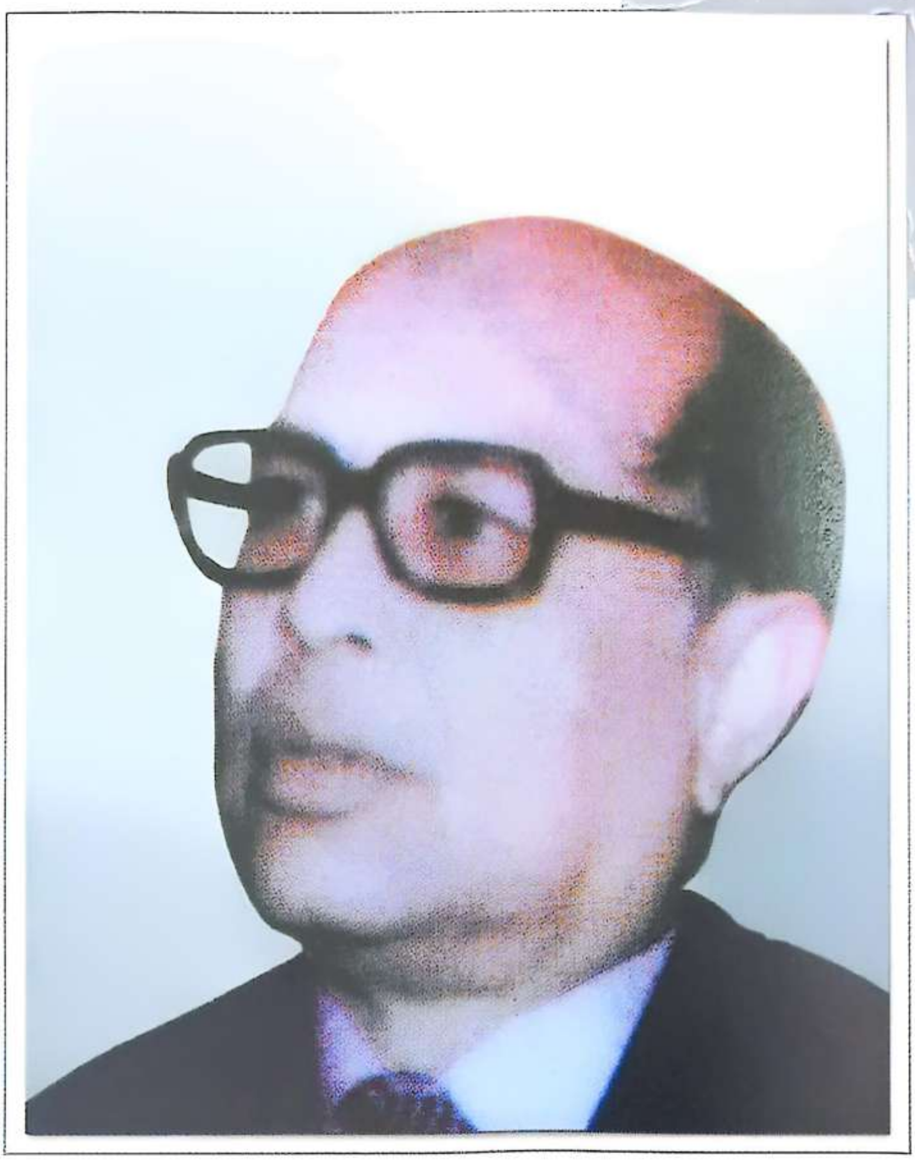

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ১৯১০ সালে রাউজানের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বায়ান্নো সালের ভাষা শহীদদের সম্পর্কে 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' শীর্ষক প্রথম কবিতা লিখে মাহবুব উল আলম চৌধুরী বাংলাভাষীদের কাছে গৌরবধণ্য হয়েছিলেন। সুদীর্ঘ এই কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে তৎকালীন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে তিনি হলেন আরেক শহীদের জনক।

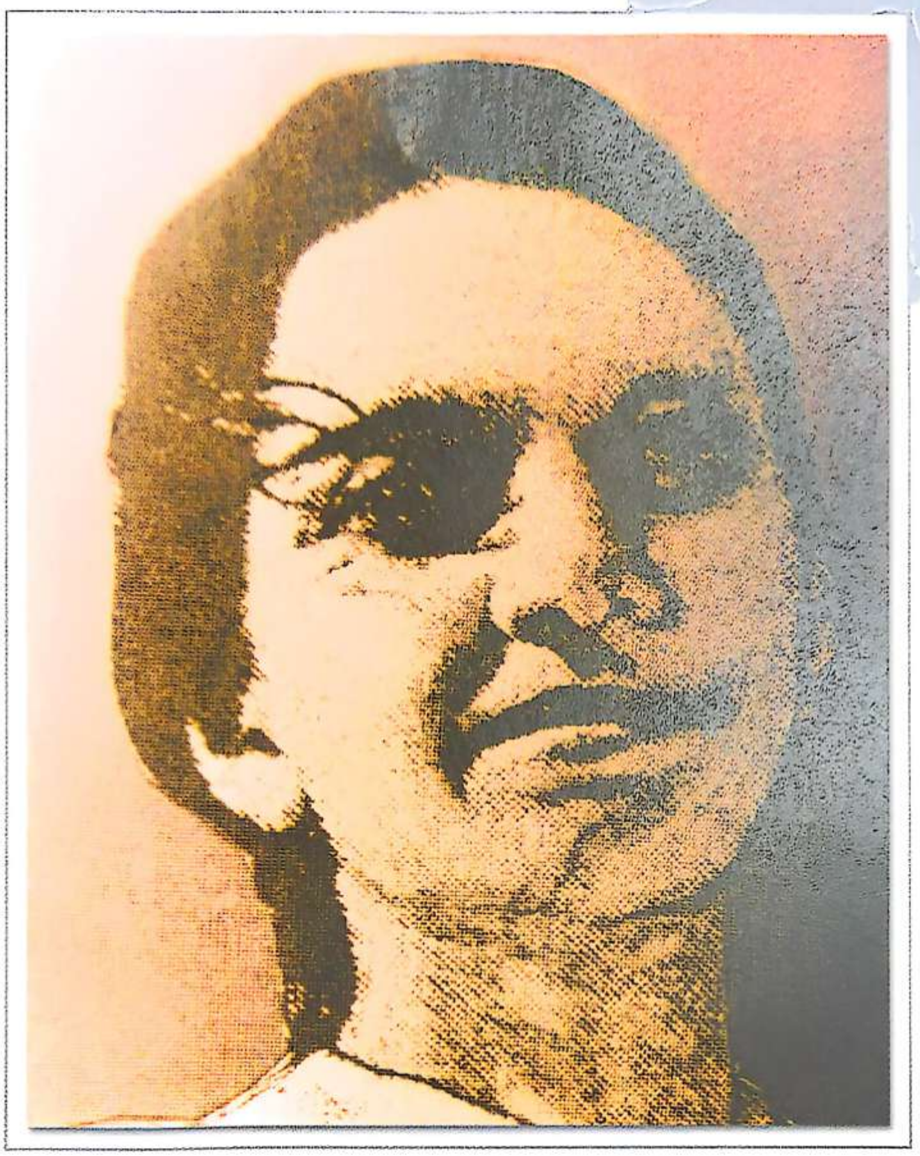

কল্পনা দত্ত

বোয়ালখালী থানার শ্রীপুর গ্রামে ১৯১০ সালে জন্ম। কলকাতার বেথুন কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত। ১৯৩১ সালের ২২ আগস্ট শ্রীপুর গ্রামের গুপ্ত ঘাঁটিতে মাস্টারদার সাথে সাক্ষাৎ। ১৯৩১ সালের ২ জুন ডিনামাইট ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ। ১৯৩৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারী গৈরলা ঘাঁটিতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ ও পলায়ন। আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামে আশ্রয়। ১৯ মে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক গহিরা আশ্রয় ঘাঁটি ঘেরাও, তারকেশ্বর দস্তিদারসহ গ্রেপ্তার। বিচারে দ্বীপান্তর। মুক্তির পর কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান।

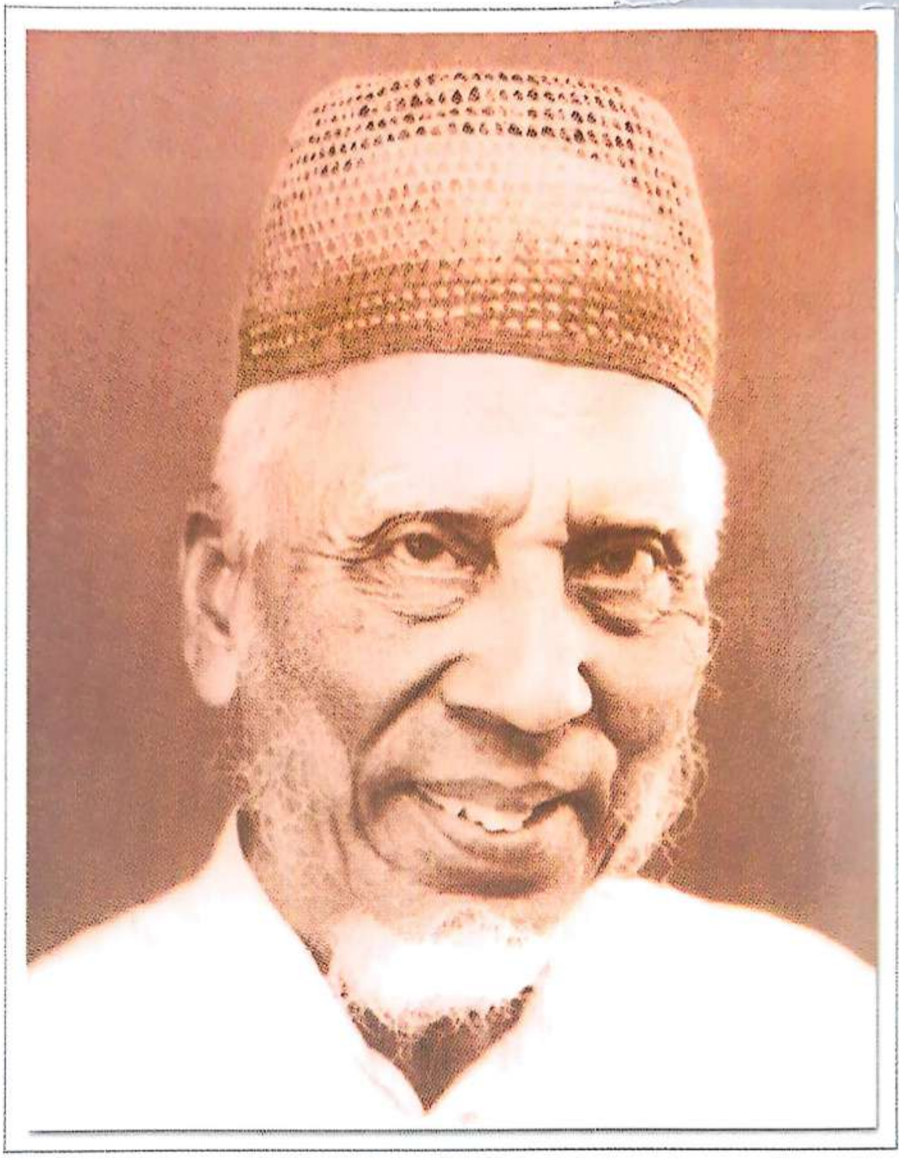

কবি অহিদুল আলম (১৯১১-১৯৯৮)

কবি অহিদুল আলম ১৯১১ সালের ১লা জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার ফতেয়াবাদ গ্রামের আলম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর চার ভাই-ই ছিলেন সাহিত্যিক। ছাত্র-জীবন থেকেই তাঁর সাহিত্য-চর্চা শুরু হয়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের সাথে পরিচয় তাঁকে আরো উৎসাহী করে তোলে। কর্ম-জীবনে তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ও পরে টিসার্স ট্রেনিং কলেজের সুপারিন্‌টেন্ডেটের পদ থেকে অবসর নেন। ১৯৭১ সালে তিনি 'জীবনে' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ সমূহ- কর্ণফুলীর মাঝি, জোহরার প্রতীক্ষা, মুকুলিকা, শামীমা, পৃথিবীর পথিক, চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য, চট্টগ্রামের ইতিহাস, চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ, ইত্যাদি। তিনি ১৯৮৯ সালে ইসলামি ফাউন্ডেশন সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৮ এর ২৪ জানুয়ারী এক সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

বিনোদ বিহারী চৌধুরী

বিনোদ বিহারী চৌধুরী ১৯১১ সালের ১০ জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার উত্তর ভূর্ষি গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম কেকে চৌধুরী। তিনি ১৯২৯ সালে স্কলারশিপসহ মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। আইএ, বিএ ও ল, বিভিন্ন কারাগার থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন। ১৯২৯ সাল থেকেই মাষ্টারদার বিপ্লবী দলভুক্ত। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের সাথে ঐতিহাসিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে দামপাড়া পুলিশ অস্ত্রগার দখল এবং চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশ নিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ে বৃটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৯৩০ সালের ২২ এপ্রিল তিনি মারাত্বকভাবে আহত হন এবং বৃটিশ বাহিনীর হাতে বন্দী হন।

তিন বৎসর পর ১৯৩৩ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তারপর তিনি কিছুদিন আত্মগোপনে চলে যান ১৯৪১ সালে পুনরায় বন্দী হন। ১৯৪৩ সালে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তাঁর ভূমিকা খুবই উজ্জ্বল। তিনি ঐ সময় বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করতেন এবং ভারত সরকারের সহযোগিতায় শরণার্থী শিবিরে প্রায় ৪০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যাতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পায়।

তিনি ৩রা জানুযারি ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে আসেন। বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রাপ্ত অর্থের এক লক্ষ টাকা ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দান করেন, এই শর্তে যে প্রতি বৎসর মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের উপর একটি স্মারক বক্তব্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এই দীর্ঘজীবি মানুষটি বহু সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে সমাজ সেবা করে যাচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-আশ্রম চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান, প্রবর্ত্তক সংঘের চেয়ারম্যান এবং প্রবর্ত্তক বিদ্যাপিঠের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর অবদানের জন্য প্রথম তাকে সম্মাননা প্রদান করেন ভোরের কাগজ কর্তৃপক্ষ। তারপর গুণীজন সম্মাননা দেন জনকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ ১৯৯৮ সালে।

তিনি বহু পুরস্কারের সাথে এদেশের সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীনতা পুরস্কার ২০০০ লাভ করেন। ৯৫ বছর বয়সেও তিনি সুস্থ শরীরে সমাজসেবায় নিয়োজিত আছেন।

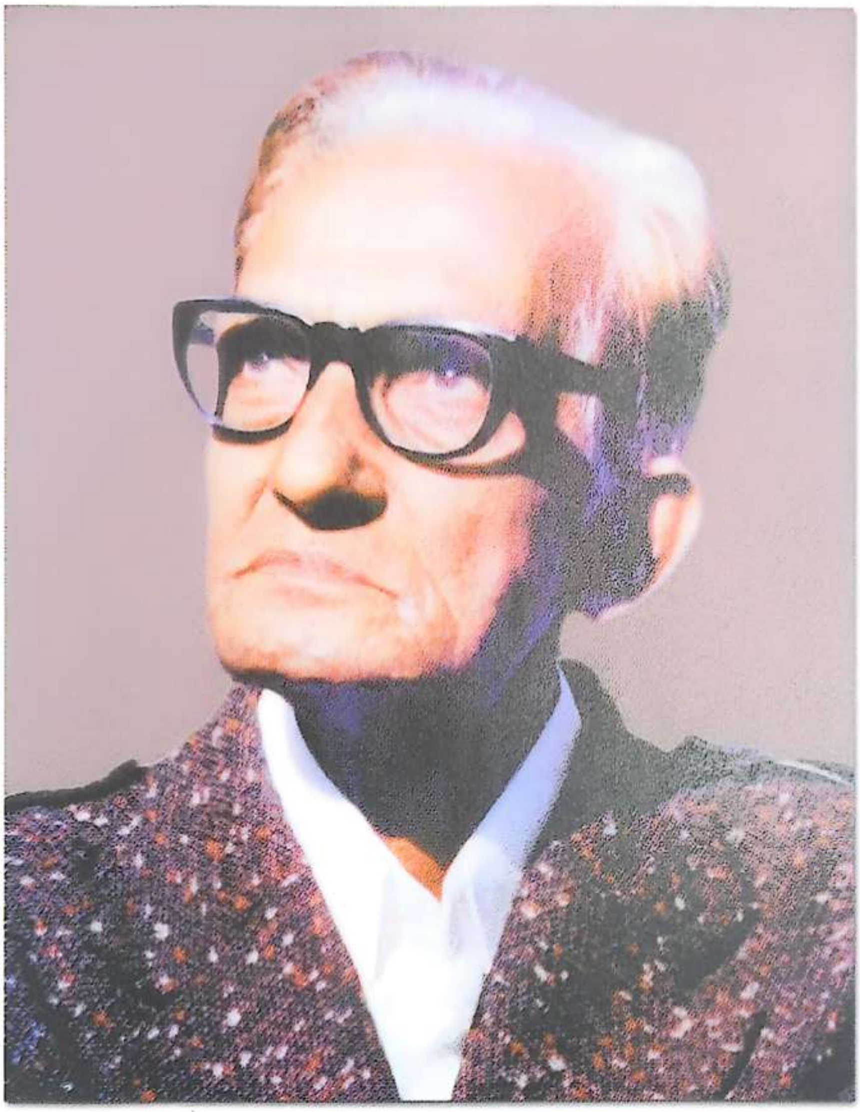

অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ (১৯১৪-১৯৯৪)

পিতা সফর আলী চৌধুরী মাতা নাছিমা খাতুন। পিতা ছিলেন স্থানীয় টি এস্টেটের ম্যানেজার। শৈশবে গ্রামের বাড়িতে মক্তবে ও মাইনর স্কুলে পাঠ্য জীবন শুরু। প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ আই, এ চট্টগ্রাম কলেজ (১৯৩২), প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা, বানিগ্রাম হাইস্কুল (১৯৩৪) ও একই কলেজ থেকে ডিস্টিংশন নিয়ে বি.এ. (১৯৩৬) এবং দ্বিতীয় বিভাগে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯ - ১৯৫৩ । চট্টগ্রাম কলেজে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। তিনি চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম আই. আই. কলেজ, লাকসাম নবাব ফয়েজুন্নেছা কলেজ, ফেনী কলেজ ও কুমিল্লায় শিক্ষকতাকালিন ৫২-র ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্বদান, শিক্ষক,আন্দোলনের ইংরেজি পাক্ষিক মুখপত্র 'দি টিচার' সম্পাদনা, ১৯৫২ সালে

কুমিল্লায় প্রগতি মজলিশ নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ঐতিহাসিক পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। শিক্ষকতা ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন (ডিসেম্বর, ১৯৫৩)। ১৯৫৩ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪-৫৭ সালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য ও চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন, ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে উপস্থিতি, মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ও কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য এবং চট্টগ্রাম জেলা ন্যাপের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে। ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারা জারি হলে কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর দীর্ঘ সময় আত্মগোপন অবস্থায় রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালান। ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানসহ দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও পটপরিবর্তনে সক্রিয় অবদান রাখেন। তিনি সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রিয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য এবং বাংলাদেশ চাষী মুক্তি সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিরিশ বছর বাম রাজনৈতিক আন্দোলনের নিবেদিত নেতা ও কর্মী। রাজনৈতিক জীবনে পনের বছর আত্মগোপনে কাটান। ১৯৮০ সালে চীনা কম্যুনিষ্ঠ পার্টির আমন্ত্রনে গণচীন সফর, অতঃপর সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে বাংলাদেশ লেখক শিবিরে যোগ দেন। এই সংগঠনের কেন্দ্রিয় কমিটির সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা প্রকাশ করেন। তিনি একজন কলামিষ্ট (১৯৪৯-১৯৯৩) উভয়বঙ্গের সংবাদ-সাময়িকীতে তাঁর সমাজ সংস্কারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, বাঁশখালী হাইস্কুলসহ বেশ কয়েকটি বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা। আসহাবউদ্দীন আহমদ শ্রেণী সচেতন লেখক। সমাজের দ্বন্দ্ব থেকে তাঁর সাহিত্যচর্চার উদ্ভব। রাজনীতি নিরপেক্ষ সাহিত্যে তাঁর বিশ্বাস নেই। দুষ্ট সমাজের সঙ্গে শিষ্টাচারমূলক আপসধর্মী রচনা তিনি লিখেননি। তিনি লোকসেবাব্রতী, সমাজবাদী। তাঁর রচনা শব্দালংকার ও অর্থালংকারে ভরপুর। তাঁর রচনা অবয়বে ছড়িয়ে থাকে হালকা হাসির ছটা আর অন্তরে থাকে ক্ষোভের কাঁটা, ব্যথিত্যের অশ্রুর ফোঁটা। এ যেন মেঘ-রোদের খেলা। তাই তিনি বিশিষ্ট ভাষা, শিল্পী, পাঠকের প্রিয় লেখক আর দেশ - কাল - সমাজ - সম্পদ সচেতন চিন্তাশীল রাজনীতিক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর, ধার, সের এক আনা মাত্র, জান ও মান. বিপ্লব বনাম অতিবিপ্লব, দাড়ি সমাচার, বাঁশ সমাচার, পথ চলিতে, হাতের পাঁচ আঙ্গুল, দ্বিপদ বনাম চতুস্পদ, ঘুষ, উজান স্রোতে জীবনের ভেলা, দামশাসন দেশশাসন, ভূমিহীন কৃষক কড়িহীন লেখক, সেরা রম্য রচনা, সংগ্রহীত রচনাবলী ঃ ১ম ও ৪র্থ খন্ড। বৌদ্ধ একাডেমী পদক পাঁচ হাজার টাকাসহ, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র পদক, চট্টগ্রাম কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ পদক, চট্টগ্রাম লেখিকা সংঘের পদক এবং নাগরিক সংবর্ধনা পরিষদ ঢাকা, ১৯৮৯ সালে পঁচাশি হাজার টাকার তোড়া উপহার। ২০০৫ সালে তিনি সাহিত্যে মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন।

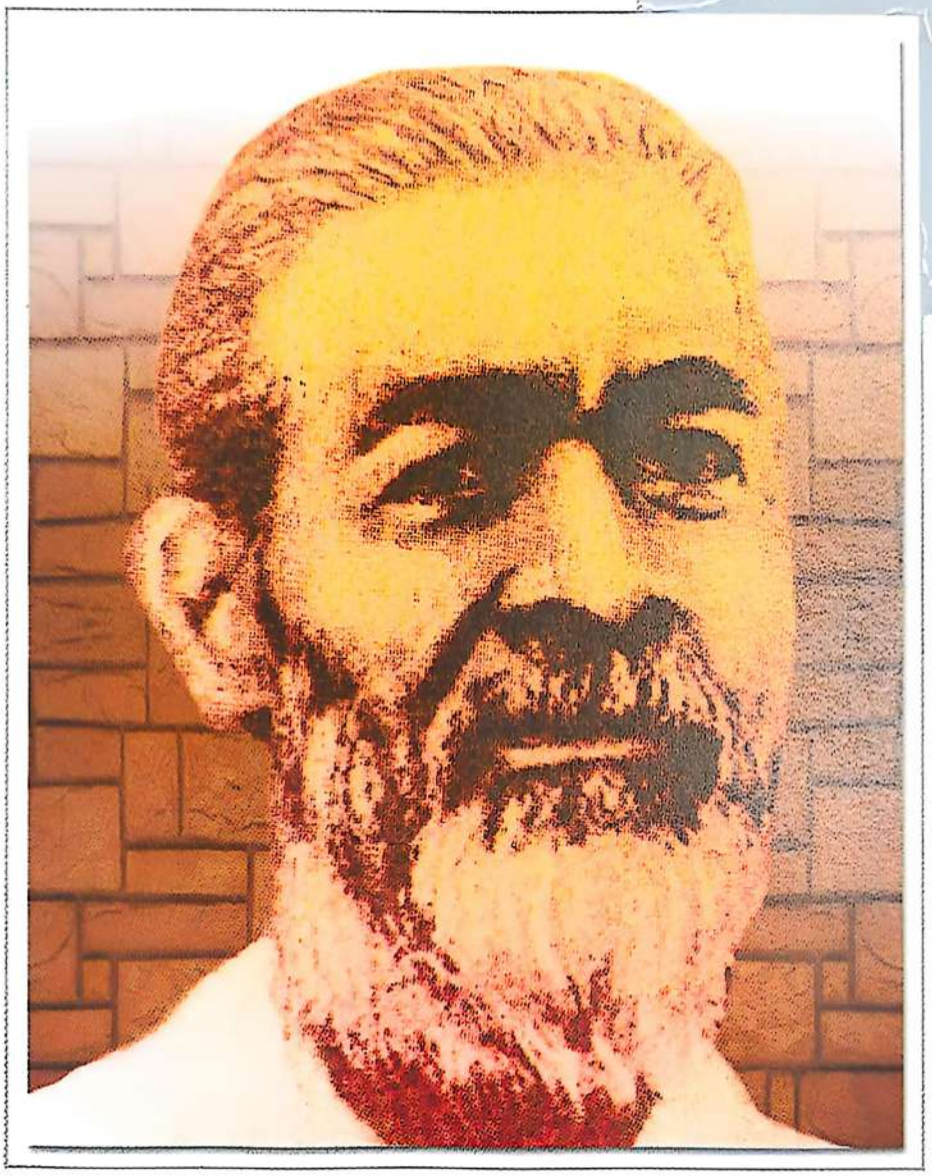

মৌলভী মীর আহমদ (১৯১৫-১৯৭৩)

বোয়ালখালী থানার পোপাদিয়া গ্রামে জন্ম। ছাত্রজীবনেই মাস্টারদার বিপ্লবী দলে যোগদান। বিপ্লবী দলের ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণ। ১৯৩৩ সালে গ্রেপ্তার, ১৯৩৮ সালে মুক্তি পেয়ে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান। ১৯৪৭ সালে হুলিয়ায় কোলকাতায় পলাতক জীবন। ১৯৭৩ সালে সেখানকার টিবি হাসপাতালে এন্তেকাল।

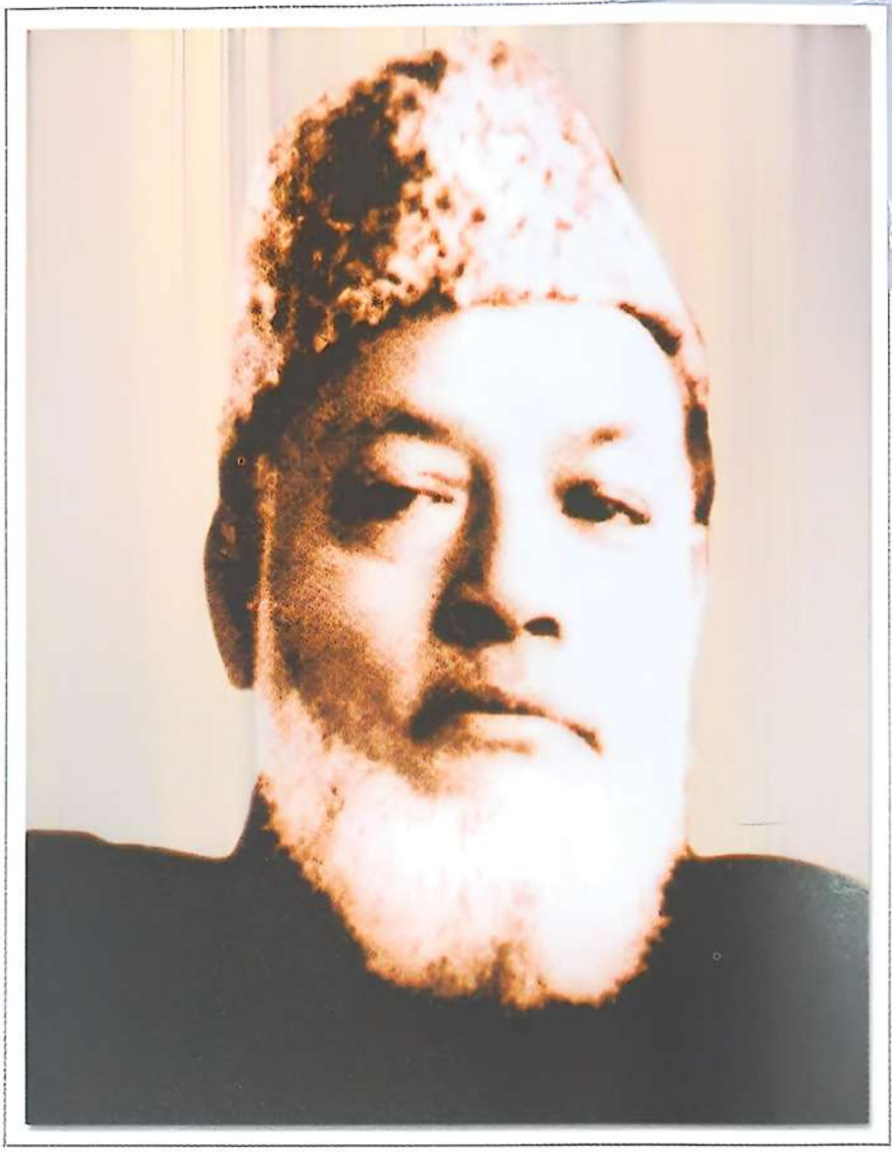

বাশদা মিঞা চৌধুরী (১৯১৫-১৯৬৭)

জনাব বাদশা মিঞা চৌধুরী ১৯১৫ সালে ১০ই অক্টোবর চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার মাদার্শা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মনু মিঞা চৌধুরী এমকম ও এলএলবি পাশ করার পর তিনি প্রথম জীবনে সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে যোগ দান করেন এবং পরবর্তীতে আয়কর উপদেষ্টা (Income Tax Adviser and Practitioner) হিসাবে যোগ দেন।

সমাজ সেবায় নিবেদিত-প্রাণ কর্মী হিসাবে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে তমগায়ে খিদমত (টিকে) পদক প্রদান করেন এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমাজ কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক সমাজ সেবার জন্য তাঁকে সম্মান-সূচক পদক প্রদান করা হয়।

মরহুম এডভোকেট বাদশা মিঞা চৌধুরী তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে সমাজসেবার উন্নত আদর্শ সৃষ্টি করেছিলেন এবং নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার জন্য কখনও তিনি প্রতিদান চাননি। প্রচারবিমুখ ছিলেন বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নিজ নামে নামকরণ করেননি। সে সময় একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর অভাবিতপূর্ণ কর্মোদ্যম এবং আশ্চর্য শ্রমনিষ্ঠা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির ইটের গাঁথুনি আর রড, বালি, সিমেন্টের গায়ে গায়ে জড়িত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: চাঁদপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন, চট্টগ্রাম নাইট কলেজ (বর্তমানে চট্টগ্রাম সরকারী সিটি কলেজ), চট্টগ্রাম আইন কলেজ (ল কলেজ), চট্টগ্রাম গার্লস কলেজ (বর্তমানে চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ), কাজেম আলী নাইট স্কুল, মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি হাই স্কুল (এমইএস হাই স্কুল), এমইএস কলেজ (বর্তমানে ওমরগণি এমইএস কলেজ), মাদার্শা হাই স্কুল (নিজ গ্রামে), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক হিসাবে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

বর্তমানে বস্তুগত সমাজে বাদশাহ্ মিঞার মত নিবেদিত-প্রাণ সমাজ কর্মীর অভাব অনুভূত হয় প্রতি পদে পদে। চট্টগ্রামের এই মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৬৭ সনের ৫ই আগষ্ট মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

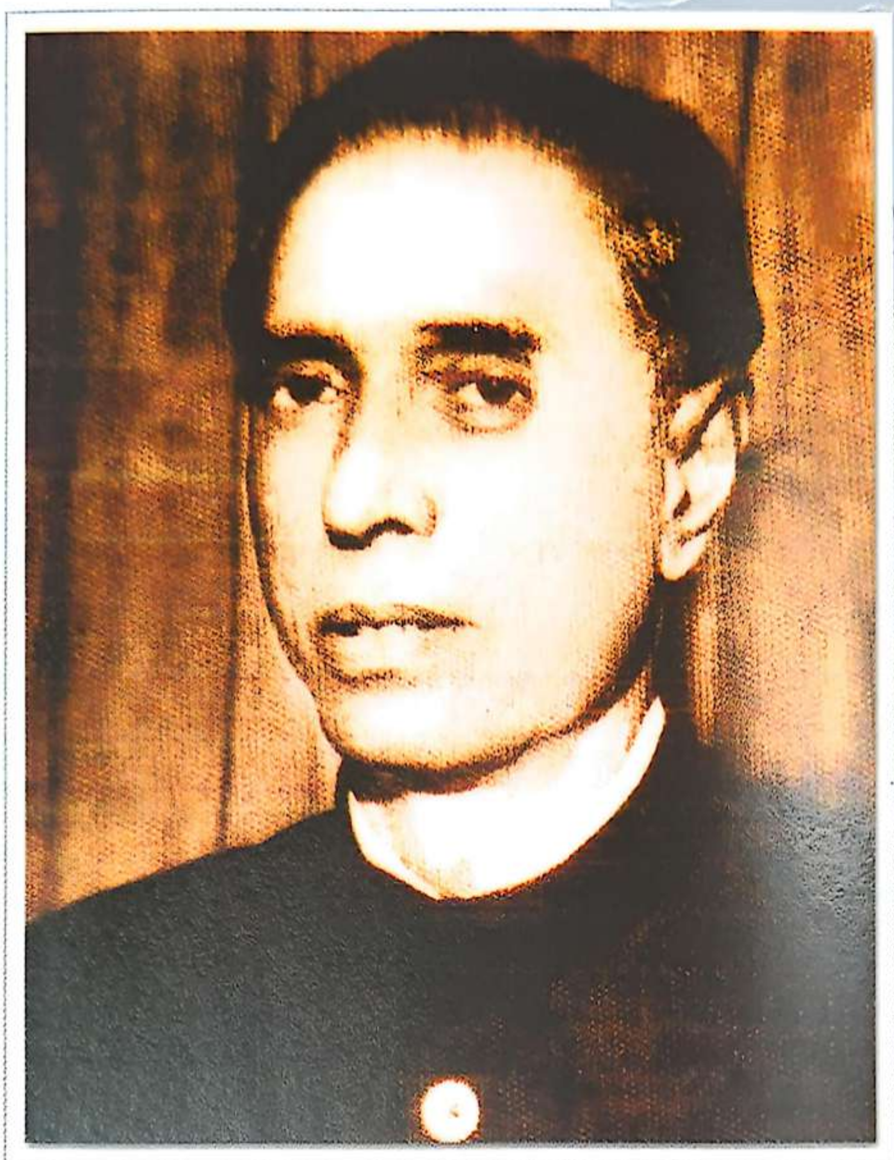

জহুর আহমদ চৌধুরীর (১৯১৫-১৯৭৪)

১৯১৫ সালে চট্টগ্রাম জেলার ডবলমুরিং থানার কাট্টলী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ। নিজ গ্রাম উত্তর কাট্টলী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাই স্কুলে অধ্যয়ন। ১৯৪৩ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে প্রথম পরিচয় ও সক্রিয় রাজনীতি শুরু।

১৯৪৬ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৪৮ টাঙ্গাইল উপনির্বাচন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘট ও বিপিসি আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৫১ মরহুম এমএ আজিজসহ যৌথ প্রচেষ্টায় আওয়ামী মুসলিম লীগ চট্টগ্রাম শাখা স্থাপন। চট্টগ্রাম খাদ্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ। ১৯৫২ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ ও পুর্নবার কারাবরণ।

চট্টগ্রাম পৌরসভার কাউন্সিলার নির্বাচিত। ১৯৫৪ আইন পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে মুসলিম লীগ প্রার্থী রফিকউদ্দিন সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ। এরপর তৎকালীন সরকার ৯২ (ক) ধারা জারি করে তাঁকে আটক করেন। ১৯৬৩ চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৬৪ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ, চট্টগ্রাম 'ডাক' (ডিএসি)-এর সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৬৬. ২৫ ফেব্রুয়ারি লালদীঘি ময়দানে ৬ দফা প্রচারের প্রথম জনসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ। বঙ্গবন্ধু এই জনসভায় ভাষণ দেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত। ১৮,১৯,২০ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক পুনঃ নির্বাচিত ও পল্টনের জনসভায় ভাষণদান। এর আগে ৮ মে ঢাকা সেন্ট্রাল হোটেল থেকে গ্রেফতার। প্রথমে ঢাকা এবং পরে কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলে স্থানান্তর। সিলেট জেলে অবস্থানকালে আইয়ুবী নির্যাতনে শ্রবণ-শক্তি হ্রাস। ১৯৬৮ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পুনঃ নির্বাচিত। ১৯৭০ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জয়লাভ। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লার দুর্গতদের মধ্যে ব্যপক রিলিফ বিতরণ।

১৯৭১ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভাপতিত্ব, পূর্বদলীয় লিভারেশন কাউন্সিলের সভাপতি হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছ থেকে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা বাণী প্রাপ্ত হন ও তা বিশ্বে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ১৬ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত বাংলাদেশে প্রথম বিজয় পতাকা উত্তোলন ও ভাষণদান। কুমিল্লা প্রশাসন চালুকরণ। ২৭ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রী সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৭৩. ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ। পরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের দ্বিতীয় মন্ত্রী সভায় শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত ও মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে পদে বহাল। ১৯৭৪. ১৯ মে সর্বশেষ চট্টগ্রাম সফর। ৪ জুন নিউব্রংকাইটিসে আক্রান্ত ও ঢাকা পিজি হাসপাতালে ভর্তি। ৭ জুন রোগাক্রান্ত হবার ফলে চট্টগ্রামের ১ দিনের সফর বাতিল। ২৮ জুন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তাঁকে হাস-পাতালে দেখতে গেলে জাতির জনকের জন্য তাঁর শেষ মোনাজাত। ৩০ জুন জাতির জনকের সঙ্গে হাসপাতালে সন্ধ্যায় তাঁর শেষ দেখা ও বঙ্গবন্ধুর হাতে শেষ বারের মত পানি পান। ১৯৭৪. ১ জুলাই সকাল ৬-৪৫ মিনিটে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ, বিকাল ২-৩০ মিনিটে তাঁর মরদেহ বিমানযোগে চট্টগ্রাম আনয়ন, ২ জুলাই সকাল ১০-৩০ মিনিটে তাঁর মরদেহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান, দুপুর ১২টায় দামপাড়ার বাসভবন সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে পূর্ণরাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মরদেহ সমাহিত করা হয়। সমাধিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ ও রাষ্ট্রদূতগণ পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার (১৯১৬-১৯৭১)

জন্ম পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে। ১৯৩২ সাল থেকেই বিপ্লবী দলের কর্মী। পরবর্তীতে আইনজীবি। জেল থেকেই আইন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন। বহুবার জেলে যান। ৩৬ বৎসর জেল খেটেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মৃত্যুবরণ।

এ কে এম ফজলুল কাদের চৌধুরী (১৯১৯-১৯৭৩)

এ কে এম ফজলুল কাদের চৌধুরী ১৯১৯ সালের ২৬ মার্চ রাউজান থানার গহিরা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল জব্বার চৌধুরী। তিনি ১৯৩৪ সালে নোয়াখালী সরকারী জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৯৩৬ সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ (বিএম কলেজ) থেকে আইএ পাশ করেন। তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজ সরকারী প্রেসিডেন্সী কলেজে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ইতিহাসে অনার্স সহ বিএ পাশ করেন ১৯৩৯ সালে। ঐ সময় তিনি কারমাইকেল হোষ্টেলের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে দুইবার ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। পরে তিনি আইন বিষয়ে ডিগ্রী নিয়ে ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট হন। ছাত্রজীবনে কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুসহ অনেক ভারত বিখ্যাত নেতার সংস্পর্শে এসে ব্যক্তি জীবনে লক্ষ্য নির্ধারিত করেন। ১৯৪০ সালে কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলীম লীগের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এ কে এম ফজলুল কাদের চৌধুরী। ১৯৪৩ সালে জানুয়ারী মাসে ফজলুল কাদের চৌধুরী সিলেটে মুসলিম ছাত্র কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময়ে সমস্ত চট্টগ্রামবাসীর জন্য ত্রাণ -এর ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে তিনি চট্টগ্রাম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের মনোনয়ন না পেয়ে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে রাউজান, রাঙ্গুনিয়া এলাকা থেকে বিপুল ভোটে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে তিনি আবার পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। তাঁর দপ্তরগুলো হলো কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ ও পূর্ত এবং শিক্ষা। ১৯৬৩ সালে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করে স্পীকার নির্বাচিত হন এবং স্পীকার থাকাকালীন তাঁর নিরপেক্ষতা, ধৈর্য, মেধা, দূরদর্শিতা ও দক্ষতা সবার নজর কাড়ে। তিনি কিছুদিন পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি আবার পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন ও পরাজিত হয়েছিলেন। পরে দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তখন শত্রুরা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে মেরে ফেলার কয়েকবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ১৮ তারিখে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সপরিবারে বন্দী হন। ১৯৭২ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং বন্দী অবস্থায় ১৯৭৩ সালের ১৮ই জুলাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনি পরলোক গমন করেন। তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে এ অঞ্চলের জন্য অনেক কিছুই করেছেন তন্মধ্যে অত্র এলাকার মানুষের প্রাণের দাবি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং যুগে যুগে তাঁর কথা এ দেশের মানুষ স্মরণ করবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর সুযোগ্য পুত্র জনাব সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মন্ত্রী পদমর্যদায় সংসদ বিষয়ক উপদেষ্ঠা হিসেবে কর্মরত আছেন।

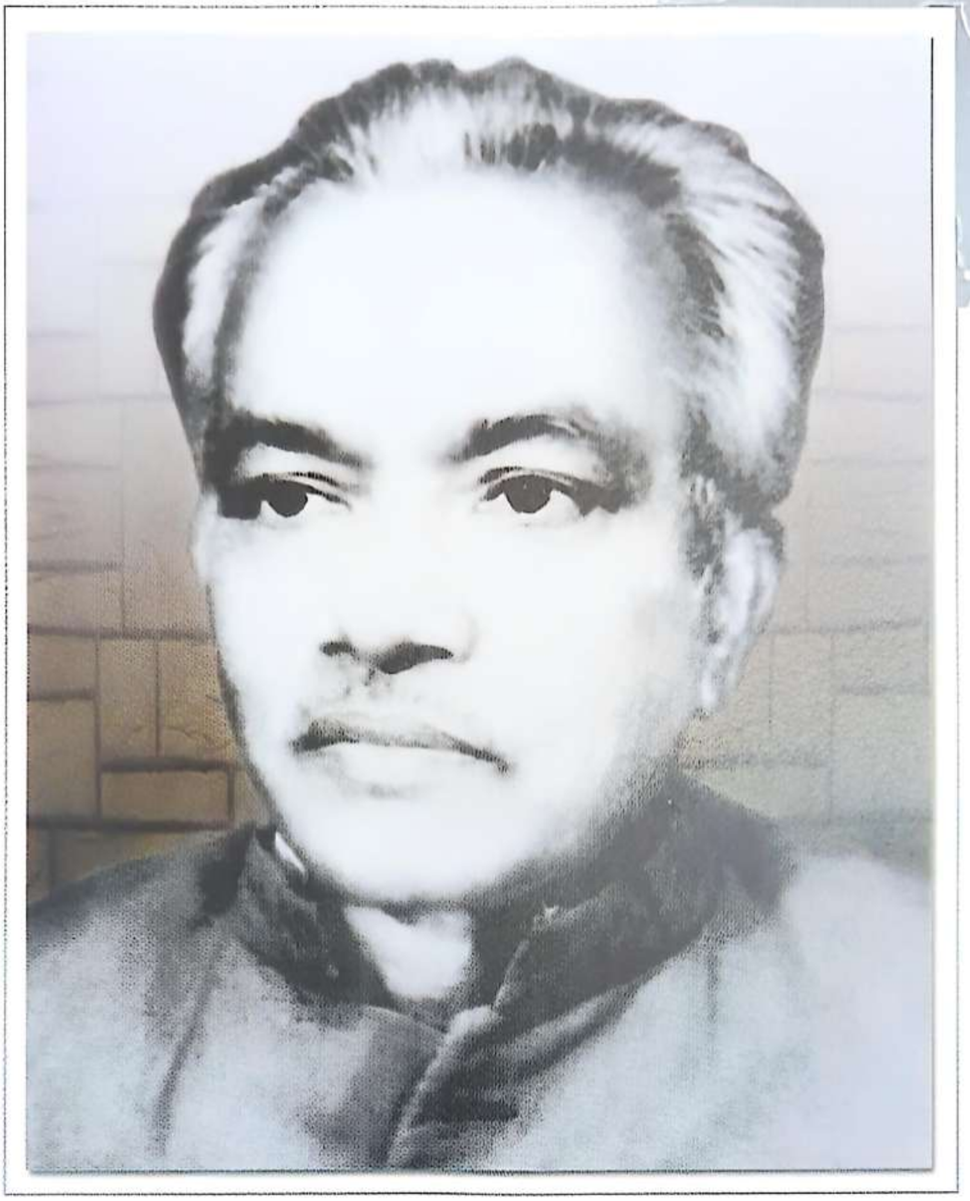

ভাষা-সৈনিক অধ্যক্ষ আবুল কাসেম (১৯২০-১৯৯১)

মহান ভাষা আন্দোলনের স্থপতি, ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোধা প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের জন্ম ১৯২০ সালে ছেবন্দী গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। ছাত্র জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার এবং বৃত্তি লাভ করে তিনি মেধার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি ডিগ্রী নিয়ে সেখানেই তিনি অধ্যাপনা জীবনের শুরু করেন। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল হন।

১৯৬২ সালে তিনি নিজ উদ্যোগে ঢাকার মীরপুরে বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুদীর্ঘ ১৯ বছর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অনেকগুলো সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান-উত্তরকালে ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠা করে মহান ভাষা আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯৪৭-এর নভেম্বরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সিলেবাস থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেয়ার প্রতিবাদে তিনি জনমত সৃষ্টি করে বাংলা ভাষাকে সিলেবাসভুক্ত করতে সরকারকে বাধ্য করেছিলেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৯৪৮ সালে ঢাকা থেকে তিনি 'সাপ্তাহিক সৈনিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি দীর্ঘকাল চালু ছিল। 'দ্যুতি' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই গণপরিষদে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা ভাষা শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও গঠনে এবং সরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা চালুর ব্যাপারে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসহ বাংলা ও ইংরেজীতে তাঁর অনেকগুলো প্রকাশিত মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার, রাইটার্স গিল্ড পুরস্কার, একুশে পদক এবং জাতীয় সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক সহ অনেকগুলো পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হন। ১৯৯১ সালের ১৯শে মার্চ যুগস্রষ্টা এই কৃতী ব্যক্তিত্বের ইন্তেকাল হয়।

এম এ আজিজ (১৯২১-১৯৭১)

এম এ আজিজ চট্টগ্রাম জেলার হালিশহরে ১৯২১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব মহব্বত আলী সরকার, মাতার নাম রহিমা খাতুন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এমএ আজিজ ১৯৪০ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪২ সালে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন।

রাজনৈতিক কারণে ১৯৪৪ সালে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় তিনি কলেজ থেকে বহিস্কৃত হন। রাজনীতি : ১৯৪০-এ মুসলিম ছাত্রলীগে যোগদান। ১৯৪৪ সালে মুসলিম লীগ রাজনীতিতে যোগদান করে পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আজীবন তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ থেকে এমএনএ নির্বাচিত হন। এক ভয়ঙ্কর উপনিবেশিক সময়ে এমএ আজিজ জন্ম নিয়েছিলেন। সংগ্রাম করেছেন প্রথমে বৃটিশ উপনিবেশ এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানি উপনিবেশের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু উত্থাপিত ৬ দফার প্রথম সমর্থক এমএ আজিজ ১৯৭০ সালেই বলেছিলেন, '৬ দফা না মানলে এক দফার সংগ্রাম শুরু হবে'। এ বক্তব্যের জন্য তিনি জেলও খেটেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি এমএ আজিজের অবিচল আস্থা ছিল তা কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে নিজের উপলব্ধিজাত বক্তব্য প্রদানে তিনি কখনও ক্ষান্ত হতেন না। এই দেশ-প্রেমিক, জনদরদী নেতা ১১ জানুয়ারী ১৯৭১ সালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অকালে মৃত্যু বরণ করেন।

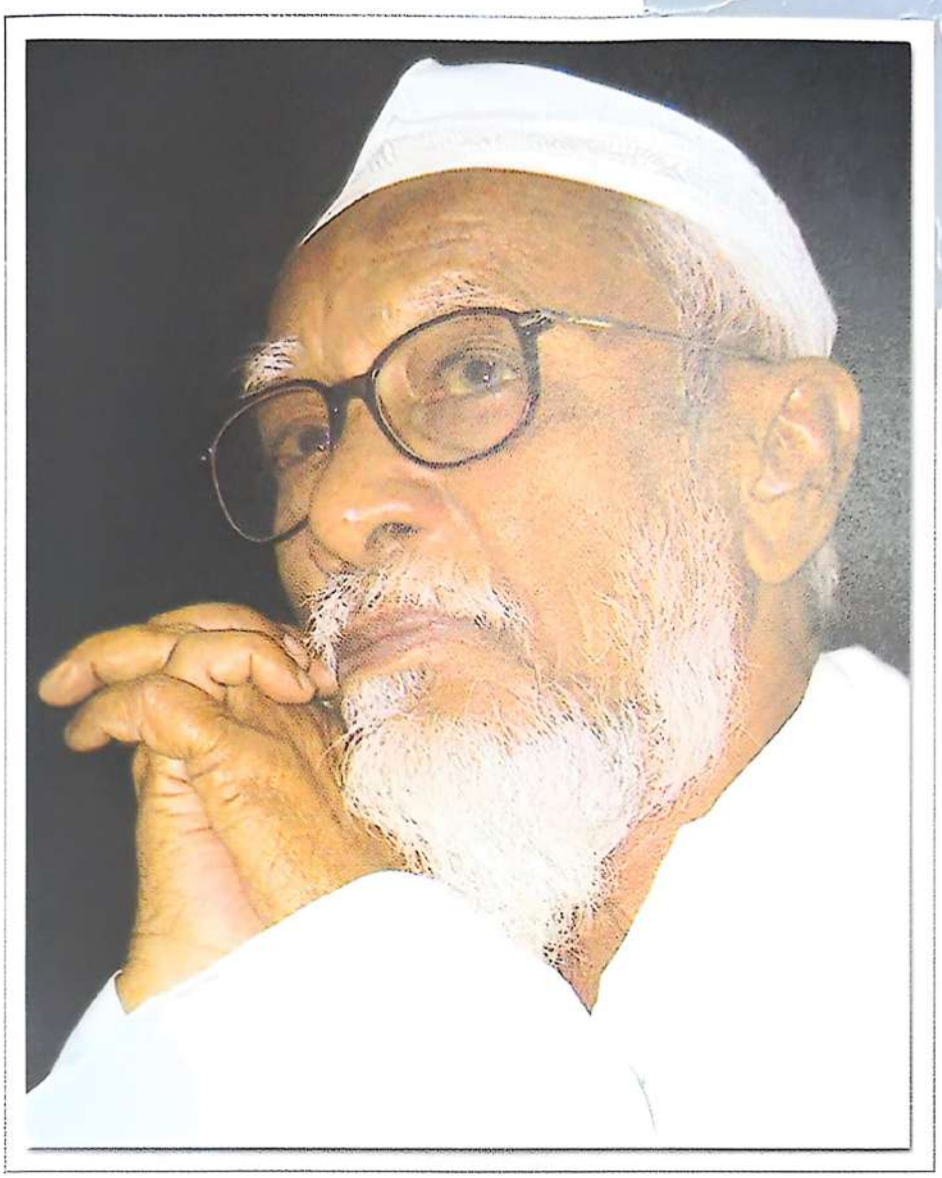

অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ (১৯২২-২০০৩)

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ ১৯২২ সালে রাউজান থানার ৫ নং সুলতানপুর ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামে স্বনাম-খ্যাত দারোগা বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বাংলার গভর্ণরের একান্ত সচিব ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম কাতারের সংগঠক। ১৯৭০ সালে হাটহাজারী-রাউজান আসন থেকে মোহাম্মদ খালেদ বিপুল ভোটে মুসলিম লীগের প্রার্থীকে পরাজিত করে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু তাঁকে গভর্ণর নিযুক্ত করেন। কিন্তু '৭৫-এর ১৫ আগষ্ট হত্যাকান্ডের পর তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। কেননা রক্ষণশীলদের হাতে রাষ্ট্রযন্ত্র কুক্ষিগত হওয়ায় সৎ , চরিত্রবান, উদারবাদী নেতৃত্ব তিরোহিত হয়। এই পঙ্কিল পরিবেশে তাঁর পক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতার অংশ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু দেশপ্রেম যাঁর মধ্যে আজীবন প্রোথিত ছিল দীর্ঘ চার-দশকের অধিক দৈনিক আজাদী'র সম্পাদকের দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করে গেছেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি দেশ ও সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধ আরো ফুটিয়ে তোলেন। আর এভাবেই অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ অভিভাবকে পরিণত হন। বহু গুণে গুণান্বিত অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ, ৭ পৌষ ১৪১০ বাংলা, ২৬ শাওয়াল ১৪২৪ হিজরী রোববার সকাল ৯টায় চট্টগ্রামের একটি ক্লিনিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

চট্টল গবেষক আবদুল হক চৌধুরী (১৯২২-১৯৯৪)

প্রতিথযশা গবেষক, চট্টলতত্ত্ব বিশারদ, ইতিহাসবিদ আবদুল হক চৌধুরী ২৪শে আগষ্ট ১৯২২ সালে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাধীন নোয়াজিশপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম দিকে ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৮ ইং পর্যন্ত প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সেই থেকে গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব পদক, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পদক সহ অসংখ্য সংবর্ধনা ও পদক লাভ করেন। চট্টগ্রামের এই বরেণ্য সন্তান ১৯৯৪ সালের ২৬ আগষ্ট ৭২ বৎসর বয়সে মৃতুবরণ করেন।

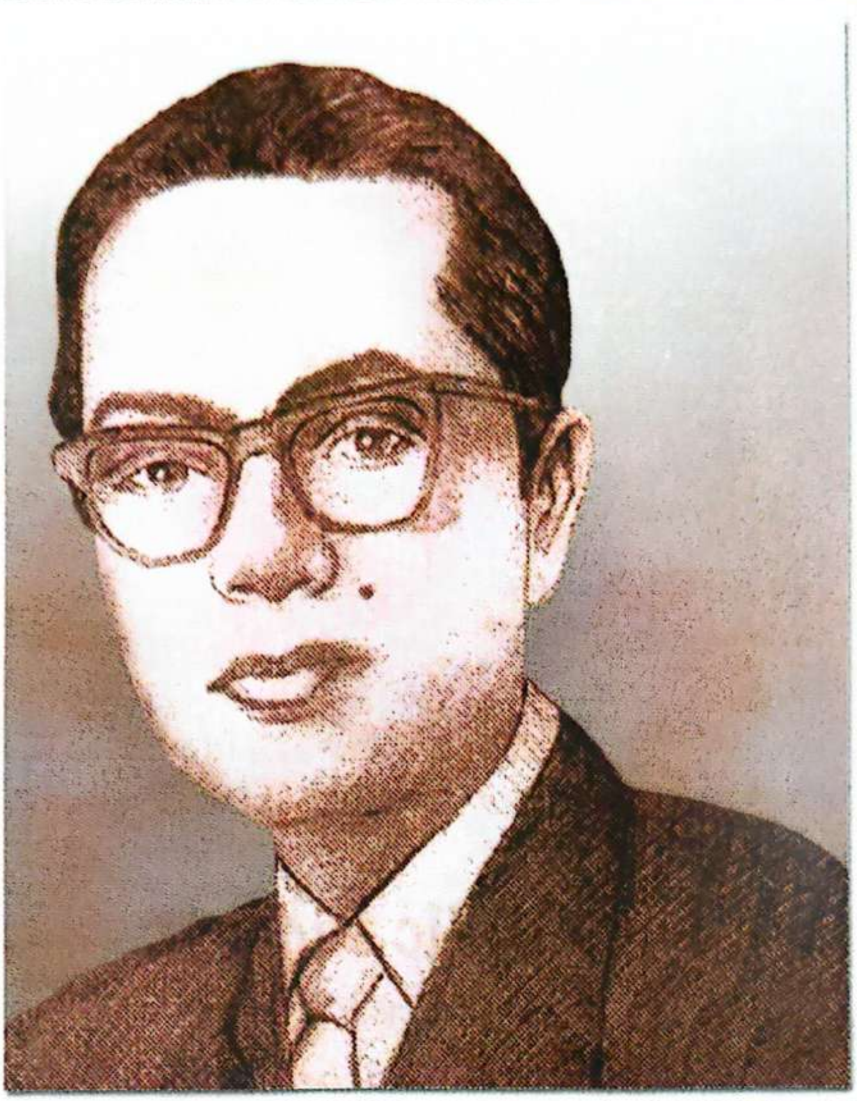

এস এম শফিউল আজম (১৯২৩-১৯৯১)

মরহুমা মোছাম্মৎ লতিফা খাতুন ও মরহুম ডা. এস এম মাহমদুল হকের প্রথম পুত্র এস এম শফিউল আজম চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার বাবুনগর গ্রামে ১৯২৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাশ করেন। ১৯৪৩ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বি এ অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এমএ পাশ করেন। এ সময় তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন।

১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে সমগ্র পাকিস্তানে প্রথম স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করেন।

দায়িত্ব পালনে যোগ্যতা, নজীরবিহীন ধী-শক্তি ও দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে ১৯৬৩ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নিযুক্ত করেন। এ সময় তিনি দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ৪৫ জন এমবিবিএস ডাক্তারকে যুক্তরাজ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। ফলে পরবর্তীতে দেশের মেডিকেল কলেজগুলো উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার লাভ করে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়। ১৯৬৯ সালে তিনি সিভিল সার্ভিসের সর্বোচ্চ পদ পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী থাকা অবস্থায় পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী তাঁকে ইসলামাবাদে সংসদ সচিবালয়ের সচিব নিযুক্ত করেন। ১৯৭৫ সালে সরকার তাঁকে কেবিনেট সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি পাট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হন। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সালে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৮৬ সালে তিনি বেসরকারী ব্যাংক ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (UCBL) চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। ১৯৯১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর দেশবরেণ্য এই ক্ষণজন্মা পুরুষ, বিস্ময়কর ও বিরল প্রতিভা, কিংবদন্তীর প্রশাসক, শিল্পায়নের অগ্রদূত, জনদরদী লণ্ডনের রয়াল ফ্রি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দীন আহমেদ (১৯২৩-২০০৪)

অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দীন আহমেদ ১৯২৩ সালে চট্টগ্রামের গহিরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৩ সালে বিএসসি (অনার্স), ১৯৪৪ সালে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ, বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগ, ইনষ্টিটিউট অব নিউট্রিশন এবং ফুড সায়েন্স বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ছিলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর কিছু মৌলিক আবিষ্কার তাঁকে দেশে ও বহির্বিশ্বে পরিচিত করে তোলে।

অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দীন আহমেদ আবিষ্কার করেন এন্‌টিবায়োটিক র‍্যামনাসিন যা এই উপমহাদেশে প্রথম। তিনি লিভার ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসাবে ভিটামিন 'ই' এর উপর এবং নিউরোলেথেরিজম- এর ক্ষেত্রে ভিটামিন 'সি' - এর প্রতিরক্ষামূলক কার্যকারিতার উপর গবেষণা করেন।

অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ও বাংলদেশ একাডেমী অব সায়েন্স - এর প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি নাফিল্ড ফাউন্ডেশন ডমিনিয়ন ফেলোশিপ্ পেয়েছিলেন। তিনি বহু আন্তর্জাতিক পর্ষদের সদস্য ছিলেন এবং বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন।

তিনি অনেক কম বয়সে খুব ভাল অধ্যাপক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন যার কারণে তিনি পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড ও টাক (TQA) ও সিতারায়ে খিদমত (SK) উপাধি লাভ করেন। তিনি কৃতিত্ব-পূর্ণ অবদানের জন্য এআরখান স্বর্ণপদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পদক, প্রধানমন্ত্রী পদক এবং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী চট্টগ্রাম ইউএসটিসি Certificate of Honour লাভ করেন।

এই প্রথিতযশা ও মেধাবী বিজ্ঞানী ২০০৪ সালের ৪ঠা জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ম্যানিলায় মৃত্যু বরণ করেন।

এম আর সিদ্দিকী (১৯২৬-১৯৯২)

সাবেক চট্টগ্রাম মহানগর পিপি মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী, সংক্ষেপে এমআর সিদ্দিকী ১৯২৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানাধীন বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের রহমত নগর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রী লাভ করে তিনি দেশে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণার্থে যুক্তরাজ্যে যান এবং তথায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে চাটার্ড একাউন্টেন্সী এবং ১৯৫৫ সালে বাণিজ্যে ব্যাচেলার ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। তৎসময়ে বাংগালী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই ১ম বিদেশ থেকে চাটার্ড একাউন্টেন্সীতে উচ্চতম ডিগ্রীধারী ছাত্র ছিলেন।

তিনি পাকিস্তানের তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী মরহুম এ কে খান সাহেবের বড় মেয়ের জামাতা ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি একজন তরুণ বাঙ্গালী শিল্প-উদ্যোক্তা হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি ক্রিসেন্ট মটর্স, ন্যাশনাল মটর্স, এসকেএম জুট মিল, ইষ্টার্ণ ব্যাংক, ইষ্টার্ণ ইন্সুরেন্সসহ বাঙ্গালী মালিকানাধীন অনেকগুলি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তরুণ শিল্পপতি হিসাবে তাঁর পরিচিতি যখন সমগ্র পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে তখন তিনি ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে স্বতন্ত্র সদস্য হিসাবে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য (এমএলএ) নির্বাচিত হন। এমএলএ থাকা অবস্থায় ১৯৬৪ সালে তিনি পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। কেন্দ্রিয় আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এর পরের বৎসর ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ২য় নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচন করে সরকার দলীয় আইউব কনভেনশন মুসলিম লীগ সমর্থিত প্রার্থীর নিকট হেরে যান। এর পূর্বে ১৯৬৪ সালে বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ (বর্তমানে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা মিলিয়ে)-এর তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। সে পদে তিনি ১৯৬৪-সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ঐসময় তিনি কেন্দ্রিয় আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষও ছিলেন। বাংলাদেশের ১ম বাণিজ্যমন্ত্রী মরহুম এমআর সিদ্দিকী দেশের জন্য, জাতির জন্য যা কল্যাণকর মনে করেছিলেন তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিলেন। সিদ্দিকীই ছিলেন প্রথম বাংগালী যিনি দিল্লী গিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বীকৃতি আদায় এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধে সমরাস্ত্রের জন্য অনুরোধ করতে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। একই ভাবে প্রবাসী সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ও জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সফর করেন। তিনি লায়নের সাথে সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন। এদেশে লায়নরা তাঁকে মনে করেন, 'Father of The Lionism.' রাজনীতিতে, মুক্তিযুদ্ধে, দেশের অর্থনীতিতে, শিল্প এবং সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এবং ঔষধ শিল্প মালিক সমিতির তিনি দুই দুইবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঢাকায় চট্টগ্রাম সমিতি গঠন, তাঁর সম্পদ বৃদ্ধি, জায়গা বাড়ানো ইত্যাদিতে জনাব সিদ্দিকীর বাস্তব ভিত্তিক পৃষ্ঠপোষকতা ছিল বলেই ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতির তিনি দুই দুইবার সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকাস্থ গুলশানের নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ডাঃ এ এফ এম ইউসুফ (১৯২৬-২০০৩)

ডাঃ এ এফ এম ইউসুফ ১৯২৬ সালে ১ নভেম্বর চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা তৎকালে চট্টগ্রামে প্রথম মুসলিম এমবি ডিগ্রীধারী প্রখ্যাত ডাক্তার, ডাঃ মোহাম্মদ ওমর। তিনি ১৯৪২ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিকলেশন । ১৯৪৪ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস পড়ালেখা করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৫১ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে লেখা পড়া করে এমবিবিএস ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ১৯৬৪ সালে ইংল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিটিএমএইচ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৬৬ সালে এমআরসিপি ডিগ্রী লাভ করেন। রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এডিনবরা, ইংল্যান্ড থেকে এবং একই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ১৯৮৪ সালে এফআরসিপি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৩ - ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের সদস্য, ১৯৭৮ -১৯৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ রিসার্স কাউন্সিলের সদস্য ও ১৯৭৯ সালে 'হু'র ভিজিটিং সায়েন্টিষ্ট ছিলেন।

তিনি চিকিৎসা পেশায় খ্যাতি অর্জনের পাশাপাশি সমাজ সেবা, ও রাজনীতির সাথেও জড়িত ছিলেন। তিনি লায়ন ডিষ্টিট্রিক্ট ৩১৫ এর গভর্নর ছিলেন। তিনি ১৯৭৭ সালে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে উবুদ্ধ হয়ে জাগোদলে যোগদান করেন। পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করেন। সেখানে তিনি উত্তরজেলা বিএনপি'র সভাপতি (১৯৭৮ - ১৯৮৬) এবং বিএনপি'র কেন্দ্রিয় কার্যকরি কমিটির সদস্য ছিলেন ১৯৭৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত। তিনি ১৯৮০ সালে জাতি সংঘের সাধারন এসেম্বিলিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও পর্তূগালের হাই কমিশনার ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামে বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকালে গুরত্বপূর্ণ ভূমিক পালন করেন ও ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। যেমন চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল, আই ইনফরমারী এন্ড ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট, ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস, ইউএসটিসি, চারুকলা কলেজ সহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান।

তিনি আই এ এইচ এস এর গভার্নিং বডির ভাইস চেয়ারম্যান ও পরবর্তীতে ইউএসটিসির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমৃত্যু আই এ এইচ এস, ইউএসটিসির সাথে নানা ভাবে জড়িত ছিলেন। এই মহান মানুষটি ১০ই এপ্রিল ২০০৩ সালে বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে মৃত্যুবরণ করেন।

ডা. কামাল এ খান (১৯২৬-২০০৩)

ডা. কামাল এ খানের জন্ম ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর, চট্টগ্রামের পটিয়া থানার বড় উঠান গ্রামে। তাঁর বাবা মৌলভী ফজলুর রহমান খান বিএবিএল ছিলেন একাধারে ব্যবহারজীবী ও জমিদার। কামাল এ খান-এর পুরো নাম কামালউদ্দিন আহমেদ খান। তিনি পটিয়ার রাহাত আলী হাই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাশ করেন। এরপর চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪-এই চার বছর তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এখান থেকে আইএ পাশ করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ নেন এবং ১৯৪৮ সালে সেখান থেকে এলএমএফ ডিগ্রি অর্জন করেন।

এলএমএফ পাশ করার পর ডা. কামাল এ খান পোর্ট কমিশনার ডাক্তার হিসাবে যোগ দেন। পরে তিনি ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস এবং লন্ডনের আই এইচএফকিং ফান্ড সেন্টার থেকে ফেলোশিপ অর্জন করেন। তিনি ছিলেন চিটাগাং পোর্ট কমিশনার মেডিকেল বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা মেডিকেল অফিসার। ১৯৬৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের মুখ্য চিকিৎসা কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল এ পদে কর্মরত থেকে ১৯৮৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীলের গণ-সংবর্ধনায় সংগঠক হিসাবে অংশ নেন।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান কাল-পর্বে ও মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে 'শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘে'র যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে তিনি ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠক। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে অধ্যাপক আবুল ফজলের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে গঠিত হয় এই সংঘ। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নয়াদিল্লির বাংলাদেশ মিশনে পালন করেন মেডিকেল ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক লিয়াজোঁ অফিসারের ভূমিকা।

চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক দিগন্তে একটি সাড়া-জাগানো ঘটনা ১৯৮৫ সালের ৯ ও ১০ আগস্ট মুসলিম ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় রবীন্দ্র-সংগীত সম্মেলন। এর অসাধারণ সাফল্যের পেছনে ডা. কামাল এ খানের ভূমিকা ছিল প্রধান। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের সংস্কৃতি ও ক্রীড়াঙ্গনের সব্যসাচী ব্যক্তিত্ব, দেশের সকল অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রাণবান সংগঠক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সেবাধর্মী নানা সংগঠনের অন্যতম প্রাণপুরুষ। ২০ জানুয়ারি ২০০৩ এই শ্রদ্ধাভাজন, সর্বজনপ্রিয়, পরিশীলিত মানুষটিকে আমরা ৭৭ বৎসর বয়সে চিরতরে হারিয়েছি।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

জন্ম ১৯২৮ সালের ১লা এপ্রিল, চট্টগ্রামে। মা গুলমেহের তাঁর জীবনে অপরিমেয় প্রভাব রেখেছেন। ১৯৫১ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এমবিবিএস- এ কৃতকার্য হন। ডা. নুরুল ইসলাম বিলাতের ওয়েলস বিশ্ববিদ্যায়ের টিডিডিতে প্রথম স্থান অধিকার করার পাঁচমাসের ব্যবধানে প্রথম পরীক্ষাতেই এমআরসিপি (এডিন) হয়েছিলেন ১৯৫৬ তে। ১৯৬৩ সালে আবার তিনি বিলাতে যান, এবার নাফিল্ড ফেলোশীপে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে।

বৃটিশ সাময়িকী তাঁকে অভিহিত করেছে আইপিজিএমআর-এর 'ফাউন্ডিং ফাদার' বলে। '৬৫ থেকে '৮৭ এর ৩১শে মার্চ জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তাঁরই হতে। আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শতেক গবেষণা নিবন্ধ।

একাডেমী অব সায়েন্সের স্বর্ণপদক বিজয়ী এ চিকিৎসা বিজ্ঞানী '৬৩ প্রেসিডেন্ট পদক, কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্বর্ণপদক, '৮৫, দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে ভারতের গোল্ডেন গ্রাহক সেবা পদক, পাকিস্তানের মদিনাতুল হিকমা'র ওসিকা-ই-আতরাফ, মহাত্মা এমকে গান্ধী অহিংস শান্তি পুরস্কার, চিকিৎসা শিক্ষাশাস্ত্রে অবদানের জন্য ভারতের বিসি রায় পদক ২০০৩, বাংলাদেশ সরকারের সমাজ সেবা পদক ১৯৯৯, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা প্রসার-এর ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ইবনে সিনা পদক '৯৫ প্রাপ্ত হন।

তিনি রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স (এডিন)-এর এমেরিটাস এডভাইজর। তিনি বাঙ্গালী জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। হামর্দদ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের তিনি ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি জাতীয় ওষুধ নীতির প্রণেতা যা দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং দেশীয় ওষুধ শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি বাংলা একাডেমীর ফেলোশীপ লাভ করেন। মালয়েশিয়ার এনস্টেড ইউনিভার্সিটি তাঁকে সম্মানসূচক ডিএসসি প্রদান করে। তিনি ইসলামিক মেডিকেল মিশনের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব; জনসেবা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান; আনোয়ারা-নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ট্রাষ্টি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এইচআরডিতে উপদেষ্টা মন্ডলীর একজন সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এন্ড সার্জনস্-এর প্রতিষ্ঠাতা কাউন্সিলর। তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রথম এইডস্ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাছাড়া তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা স্বাধীনতা পদকসহ দেশ-বিদেশের বহু পদকে ভূষিত হয়েছেন।

বিশ্বনন্দিত 'আধুনিক' (আমরা ধূমপান নিবারণ করি)-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বিশ্বের প্রায় সবগুলো ধূমপান বিরোধী মহাসম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে যোগ দেন এবং ধূমপানমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে যাচ্ছেন। তাঁর এই সফল আন্দোলনের ক্ষেত্রে অতিসম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল এন্টিটোব্যাকো ফাউন্ডেশন এক-স্মরণীয় মাইলফলক।

আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে শতোর্ধ চিকিৎসা গবেষণা নিবন্ধ ছাড়াও শুধু ধূমপানবিরোধী তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় একশত। তিনি প্রায় ২৫টির মতো বই রচনা ও কয়েকটি সংকলন প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত বইগুলোর মধ্যে Medical Diagnosis & Treatment , প্রেসক্রিপশন, পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশকীয় ঔষধ বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। আইএএইচএস এবং বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইউএসটিসি (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম)-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। আন্তর্জাতিক মানের এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম ফসল, অবিনশ্বর কীর্তি।

ড. আবদুল করিম

প্রফেসর আবদুল করিম চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার চাপছড়ি গ্রামে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ ওয়াইজুদ্দীন ও মাতার নাম সৈয়দা রশীদা খাতুন। তিনি স্বগ্রামে মৌলানা মুনীরুজ্জামানের নিকট লেখাপড়া শুরু করেন এবং স্বগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর পড়াশুনা করে পার্শ্ববর্তী বাহারছড়া স্কুল থেকে উচ্চ প্রাইমারী পাশ করেন। বৈলছড়ি জুনিয়র মাদ্রাসা পাশ করে ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঐ কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে তিনি ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯ সালে ইতিহাসে বিএ অনার্স ও ১৯৫০ সালে ঐ একই বিষয়ে এমএ পাশ করেন।

তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন এবং এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে ১৯৫৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রীডার পদে উন্নীত হন এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে এসিসটেন্ট হাউজ টিউটরের এবং হাউজ টিউটরের দায়িত্ব পালন করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৬৬ সালে ড. করিম ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে রীডার ও বিভাগীয় সভাপতি নিযুক্ত হয়ে আসেন। তিনি আলাওল হলে প্রভোস্টের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি ইতিহাসের প্রফেসর পদে উন্নীত হন এবং ১৯৭৫ সালে নভেম্বর মাসে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ঐ পদে তিনি প্রায় ছয় বৎসর কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৮৪ সালে ড. করিম চট্টগ্রামস্থ বায়তুশ শরফ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে মহাপরিচালক পদে যোগ দেন এবং প্রায় চার বৎসর ঐ দায়িত্ব পরিচালনা করেন। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ড. করিম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের সিনিয়র ফেলো হিসাবে নিযুক্ত থেকে গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন। ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার-নিউমারারী প্রফেসর হিসাবে কর্মরত থাকেন এবং ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ইমেরিটাস হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

ড. করিম একজন ভাল গবেষক এবং লেখক। ইতিহাস গবেষণায় তিনি শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছেন। ইতিহাসের সহায়ক বিজ্ঞান, যেমন শিলালিপি এবং মুদ্রা চর্চায়ও তিনি দেশে-বিদেশে সম্মানজনক অবস্থানে রয়েছেন। মুদ্রাতত্ত্বে তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ ন্যুমেজমেটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া ১৯৬০ সালে আকবর সিলভার মেডেল দিয়ে সম্মানিত করেন। এই পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজীতে তাঁর ৩৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থগুলো সবকটি গবেষণামূলক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর গবেষণা পত্রের সংখ্যাও বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় প্রায় তিনশতের মত।

তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ তাঁকে অনারারী ফেলোশীপ প্রদান করেন এবং ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদক দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত আছেন। তিনি দীর্ঘদিন রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন এ্যান্ড আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ন্যুমেজমেটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

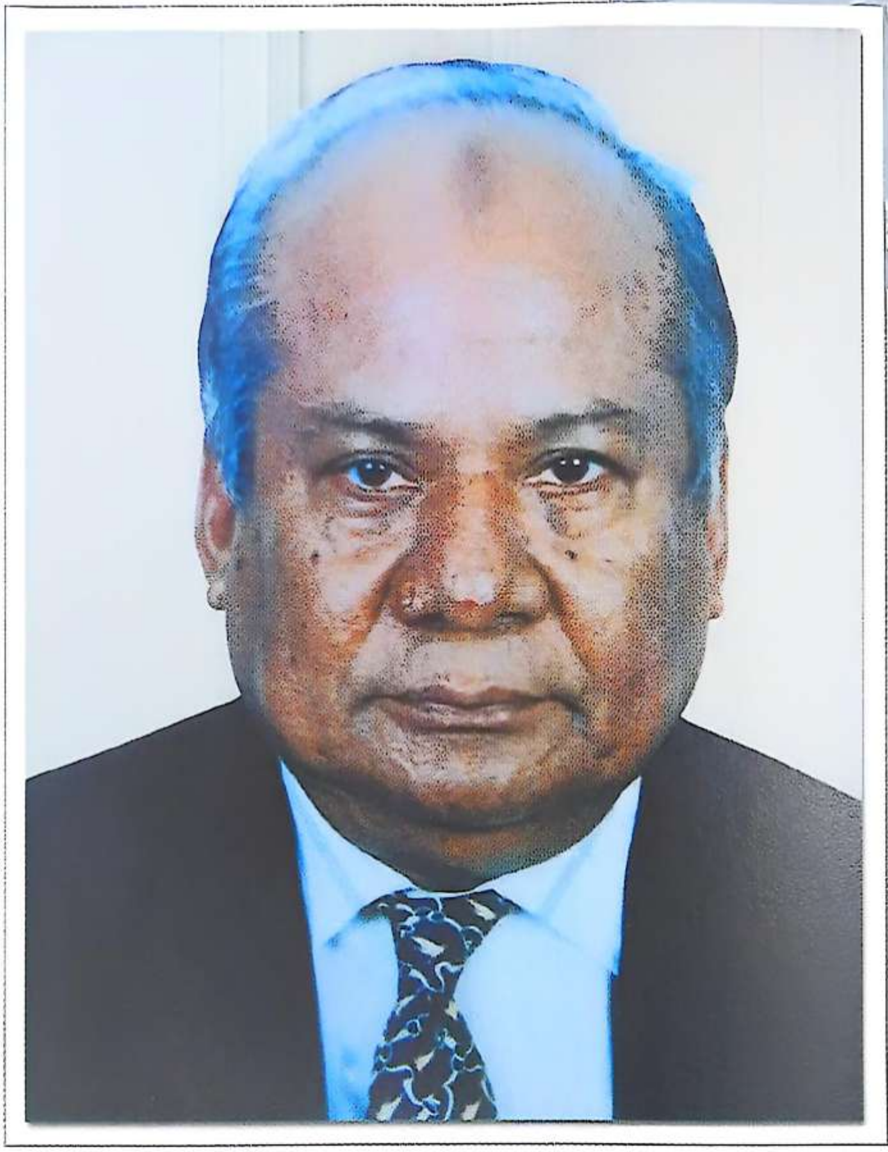

আলহাজ্ব এমএ সালাম (১৯৩৮-২০০২)

এমএ সালাম ১৯৩৮ সালে ১৩ আগষ্ট ডবলমুরিং থানার মুহুরীপাড়ায় পৈত্রিক নিবাসে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ্ব আবদুর রহমান কন্ট্রাক্টর ও মা আলহাজ্ব আছিয়া খাতুনের আট ছেলে ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ৯ম সন্তান। কবি আলাওল ছিলেন তাঁর পূর্ব-পুরুষ। ফলতঃ মোগল আমলে তাঁর পূর্ব- পুরুষ হাটহাজারী থেকে মুহুরীপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন।

স্থানীয় মক্তবে তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। এরপর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাকের মিয়া হাই স্কুল, বেগম জান হাই স্কুল ও চট্টগ্রাম কলেজে তিনি পড়াশুনা করেন। পরে আইসিএস থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তিনি ডিপ্লোমা নেন। ১৯৫৮ সালে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ফজলুল কাদের চৌধুরীর হাত ধরে তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ এবং মুসলিম লীগে যোগদান।

আমৃত্যু বিভিন্ন পর্যায়ে ও পদে মুসলিম লীগের আদর্শ ও সক্রিয় রাজনীতিতে অটল থাকেন। মৃত্যুকালে বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি পদে তিনি আসীন ছিলেন। বলাবাহুল্য, সম্মান ও পদলোভে দলীয় আদর্শ বর্জন ছিলো তাঁর চোখে বড় অপরাধ ও পদস্খলন। ১৯৭৬ ও ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মহানগরী ৮ নির্বাচনী এলাকা থেকে অংশ গ্রহণ করেন। প্রধানত কনস্ট্রাকশান সহ বহুবিধ ব্যবসায় ছিল তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য। পারিবারিক ঐতিহ্য ধারা থেকেও তিনি ছিলেন অবিচ্ছিন্ন। একজন রাজনীতিবিদই নন, একজন সফল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি হিসাবে তিনি ছিলেন সমধিক পরিচিত। কেবল আপন স্বার্থ প্রণোদিত হয়েই নয়, বেকারত্ব ঘুচিয়ে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে তিনি একের পর এক স্থাপন করেন শিল্প প্রতিষ্ঠান। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষস্থানীয় ক'জন শিল্পপতিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ । তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: প্রগ্রেসিভ ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ইন্টারন্যাশনার ফ্রোজেন লিঃ, ইষ্টার্ন স্ট্র-বোর্ড এ্যান্ড পেপার মিলস্ লিঃ, আনোয়ার জুট মিলস্ লিঃ, সেলিম এন্ড ব্রাদার্স লিঃ এবং এ আর প্রপাটিজ ডেভেলাপমেন্ট (প্রাঃ) লিঃ। এ ছাড়া যৌথ ব্যবস্থাপনায় তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় পূরবী জেনারেল ইন্সুরেন্স ও ইষ্টার্ন সিমেন্ট। বর্তমানে তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছেলেরা উপরোক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুদক্ষ পরিচালনায় রত। তাঁর ভাষায় - "ছোটবেলা থেকে আমি সামাজিক কাজে অভ্যস্ত। রাজনীতি করেছি, ব্যবসা করেছি।" ফলতঃ রাজনীতি ও ব্যবসা তাঁর পেশা হলেও, নেশা ছিল সমাজ কর্মে ও মানুষের কল্যাণে আত্মনিবেদন। তাঁর এই সদিচ্ছা ও মহৎ কর্মের ফলশ্রুতি হচ্ছে আলহাজ্ব এম এ সালাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যালয়, আগ্রাবাদ হাই স্কুল, সিলভার বেলস প্রাইমারী স্কুল (বর্তমানে হাই স্কুলে উন্নীত), পাহাড়তলী কলেজ, ইউএসটিসি এবং আছিয়া রহমান এডুকেশনাল কমপ্লেক্স। এই প্রসঙ্গে ইউএসটিসি ও পাহাড়তলী কলেজকে তাঁর জমিদান ও আর্থিক সাহায্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফলতঃ পৌর এলাকার বহু মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ, স্কুল, কলেজ ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান পেয়েছে গোপনে-প্রকাশ্যে তাঁর দানের হস্তস্পর্শ। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং পারিবারিক কাজে সতত শত ব্যস্ততার মধ্যেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নানা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ একজন সুনাগরিক ও মানুষ হিসাবে তিনি নিজের দায়িত্বের অন্তর্গত বলে বিশ্বাস করতেন। এতে তিনি লাভ করেন অপার আনন্দও। চট্টগ্রামের অন্যতম বিরল গৌরব ইউএসটিসি-তে তিনি একাধারে ছিলেন - সিন্ডিকেট সদস্য, নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান ও বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল কমিটির চেয়ারম্যান। এছাড়া ছিলেন আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম-এর সদস্য, বৃহত্তর চট্টগ্রাম উন্নয়ন কমিটির আহবায়ক, পাহাড়তলী কলেজ পরিচালনা পরিষদে আজীবন সদস্য এবং অন্যান্য বহু সংস্থাসহ সর্বোপরি বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি। অধিকন্তু জমিয়াতুল ফালাহ কমপ্লেক্স গভর্নিং বডির সদস্য হিসাবে তিনি পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা। তিনি ২০০২ সালের ১৯শে নভেম্বর মৃত্যু বরণ করেন।

কে এম শিহাবউদ্দিন

কে এম শিহাবউদ্দিনের জন্ম চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার মোহাম্মদপুর গ্রামে, ১৯৪০ সালে। তাঁর পিতা মরহুম ইদ্রিছ মিয়া বিএবিটি হাই স্কুলের একজন খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মাতা আখতারুন্নেছা বেগম একজন গুণশীলা মহিলা। তিনি মাষ্টার ডিগ্রী লাভ করার পর সিলেট এমসি কলেজ, বগুড়া আজিজুল হক কলেজ এবং চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে শিক্ষকতা করেন।

১৯৬১ সাল থেকে কে এম শিহাবউদ্দিন পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনে প্রথম সচিব ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনিই প্রথম কূটনীতিবিদ যিনি পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দেন। তিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন উচ্চ পদ মর্যাদায় দেশের সেবায় নিয়োজিত থেকে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

তিনি পোলান্ড, হাঙ্গেরী, কুয়েত, ইয়েমেন, ফ্রান্স এবং স্পেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্তব্য সম্পাদন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর দায়িত্বকালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন, যা এ যাবৎ কালে কোন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রথম বাংলাদেশ সফর। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন।

একই সাথে তিনি মেক্সিকো, কলাম্বিয়া, গুয়েতেমালা প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করছেন। কুয়েতে তিনি রাষ্ট্র দূতের দায়িত্ব পালন করা কালীন অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দেন। ১৯৯০ সালে ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রমন করার পর তিনি ইরাকী নির্দেশ অমান্য করে বাংলাদেশ মিশনের কাজ চালিয়ে যান এবং ৭৫ হাজার বাঙ্গালীদের দেশে ফেরার সুযোগ করে দেন। সেইজন্য ইরাকী কর্তৃপক্ষ তাঁকে ২ সপ্তাহ বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে ইরাক ত্যাগের উপর নিষেধ আজ্ঞা আরোপ করেছিল।

তিনি জাতিসংঘের ও ইউনেস্কোর অসংখ্য অধিবেশনে যোগদান করেন। তাঁর স্ত্রী বেগম খালেদা মুক্তিযুদ্ধে স্বামীর সাথে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অবসর নেন। বর্তমানে তিনি আত্মকাহিনী লেখায় ব্যস্ত।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুস

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুস ১৯৪০ সালের ২৮শে জুন চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তিনি গ্রামীণ ব্যাংক-এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যাবস্থাপনা পরিচালক। এই ব্যাংক ১৩৭৫ টি শাখায় ৪৮৯৫৪ টি গ্রামের ৪১ লক্ষ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ঋণ দান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ধারণা তাঁরই সৃষ্টি, যেখানে কোন প্রকার জামানত ছাড়া দেশের দরিদ্র লোকদের মাঝে ঋণ প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক ড. ইউনুস যুক্তরাষ্ট্রের ভেন্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে লেখাপড়া করেন এবং ১৯৭০ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি মিডল টেনিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৭৬ সালে তিনি গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প শুরু করেন যা ১৯৮৩ সালে পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক এর রূপ লাভ করে। গ্রামীণ ব্যাংক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রামের দরিদ্র লোকদের প্রধানতঃ দরিদ্র মহিলাদের ঋণ দিয়ে থাকে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন:

রেমান মেগস্যাসে পুরস্কার (১৯৮৪), ফিলিপাইন; আগাখান পুরস্কার স্থাপত্যের জন্য (১৯৮৯), সুইজারল্যান্ড: মোহাম্মদ সাবডিন পুরস্কার, বিজ্ঞান, সামাজিক অর্থনীতি (১৯৯৩), শ্রীলংকা; বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার (১৯৯৬), ভেনিজুয়েলা; শান্তির জন্য মানুষ পুরস্কার (১৯৯৭), ইটালী; প্রিন্স অফ অসটরিয়াস পুরস্কার (১৯৯৮) জাপান; ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কার (১৯৯৮) ভারত; সিডনী শান্তি পুরস্কার (১৯৯৮), অস্ট্রেলিয়া; রোটারী পুরস্কার (১৯৯৯) যুক্তরাষ্ট্র; গোল্ডেন পেগাসাস পুরস্কার (১৯৯৯) ইটালী; রোমা পুরস্কার (১৯৯৯) ইটালী; রাজা হোসেইন হিউমেনিটারিয়ান লিডারশিপ পুরস্কার (২০০০) জর্দান; এশিয়া পুরস্কার (২০০৪) জাপান; দি ইকোনমিষ্ট পুরস্কার (২০০৪) যুক্তরাষ্ট্র।

দেশেও তিনি লাভ করেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার (১৯৭৮), কেন্দ্রীয় ব্যাংক পুরস্কার (১৯৮৫), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৮৭), (সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার)। তিনি প্রথম সভাপতিত্ব করেন পলিসি এডভাইজরী গ্রুপ অব সিজিএপি। ইউএনএইস-এর জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সুনাম দূত নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন জাতিসংঘ কর্তৃক। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক তাঁকে সম্মাননা প্রদান করেন।

তিনি বিশ্বে প্রায় ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

অধ্যাপক ইউনুস অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় জড়িত। গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়াও তিনি আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা; যেমন গ্রামীণ ফোন, গ্রামীণ সাইবারনেট, গ্রামীণ কমিউনিকেমন, ইত্যাদি।

ড. অলি আহাম্মদ বীর বিক্রম

কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম ১৯৪১ সালে চন্দনাইশের এক সম্ভ্রান্ত 'কুতুব' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। স্বীয় দক্ষতার গুণে তিনি সেনাবাহিনীতে ১৯৮০ সালে কর্নেল পদোন্নতি পান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকাবস্থায় তিনি তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধে অসীম বীরত্বের জন্য তিনি 'বীর বিক্রম' উপাধিতে ভূষিত হন।

সেনাবাহিনী হতে অবসর গ্রহণের পর তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে চন্দনাইশ নির্বাচনী এলাকা হতে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৮২ সালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও ১৯৯১ সালে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর যোগাযোগ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য। তিনি বহু দেশ সফর করেন এবং বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ফোরামে নেতৃত্ব দেন। উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বের গুণে '৯২ সালে ষ্টেটসম্যান'স হুজ-হু-তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিরল সম্মান অর্জন করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের কৃষি, খাদ্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত থাকলেও তিনি পড়ালেখায়ও মনোনিবেশ করেন এবং ২০০৩ সালে ইংলেন্ডের Oxford Brookes University থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার Title ছিল 'Revolution, Military Personnel and War of Liberation in Bangladesh' এ ধরনের কর্মকাণ্ড আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে বিরল ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সরকারী-বেসরকারী বহু সংস্থার সাথে সংযুক্ত থেকে দেশ ও সমাজ সেবার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বিভিন্ন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি চন্দনাইশের আমানত ছফা বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ, গাছবাড়িয়া মমতাজ বেগম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। সাতবাড়িয়া অলি আহমদ বীর বিক্রম কলেজ, হাসিমপুর অলি আহমদ বীর বিক্রম বালিকা বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর স্ত্রী মমতাজ বেগম চন্দনাইশ নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য ছিলেন ও তিনি সাতকানিয়া লোহাগাড়া নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য ছিলেন। বর্তমানে চন্দনাইশ নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য। চন্দনাইশ থানা প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি একজন সফল, জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ ও ধর্মানুরাগী ব্যক্তিত্ব।

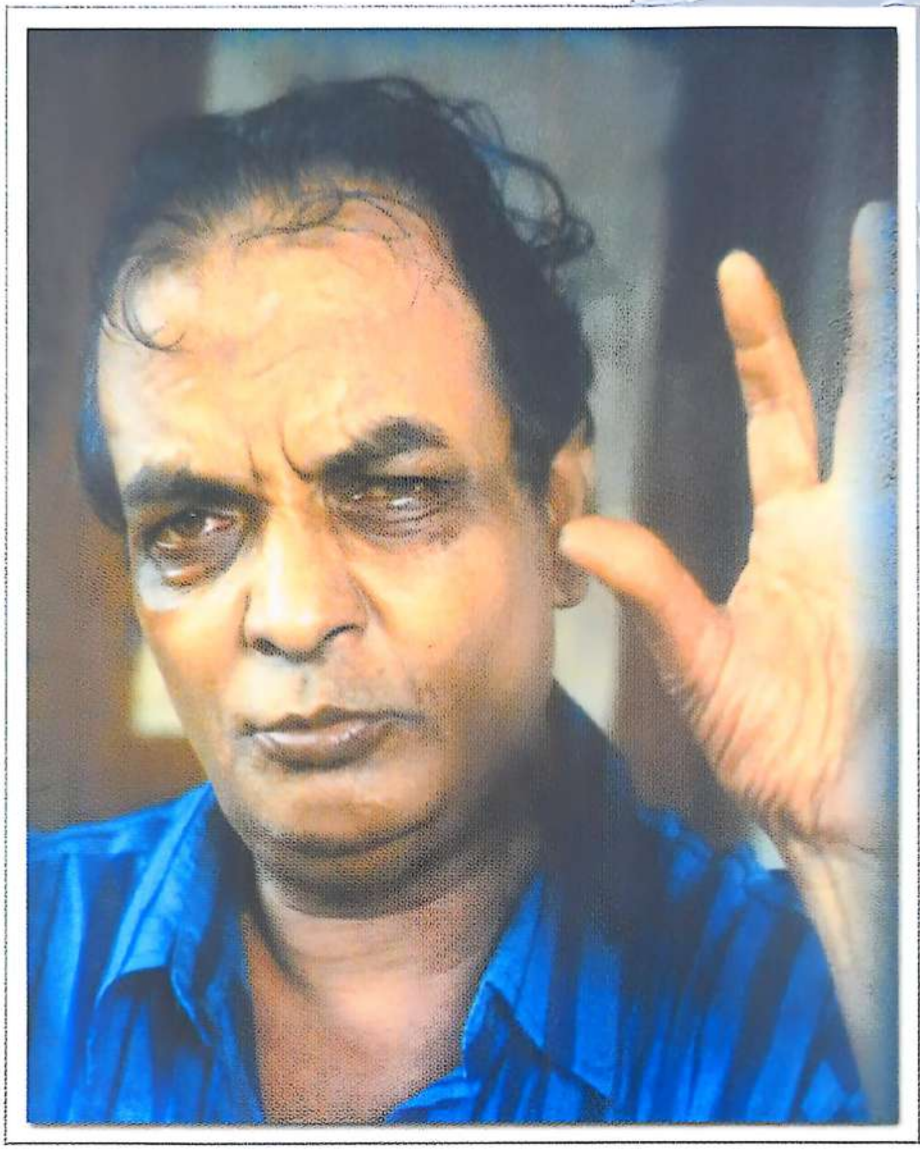

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)

জন্ম : ৩০ জুন ১৯৪৩ সাল। পিতা : মরহুম হেদায়েত আলী ওরফে ধন মিয়া। গ্রাম : গাছবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। শিক্ষা : মাধ্যমিক ১৯৬০- গাছবাড়িয়া নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র বিদ্যালয়, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। উচ্চমাধ্যমিক ১৯৬২- নাজিরহাট কলেজ, চট্টগ্রাম। স্নাতক (প্রাইভেটে) ১৯৬৭- ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে অনার্স অধ্যয়ন ও পরীক্ষা বর্জন)।

স্নাতকোত্তর ১৯৭১- রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পিএইচডি গবেষণা (অসম্পূর্ণ), গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক জাতীয় অধ্যাপক আবদুল রাজ্জাক। জার্মান ভাষায় ডিপ্লোমা (১৯৮৬) জার্মান।

পেশা : লেখালেখি।

সাংবাদিকতা ও সম্পাদনা : সম্পাদকীয় উপদেষ্টা- দৈনিক গণকণ্ঠ, প্রধান সম্পদক-সাপ্তাহিক উত্তরণ, সম্পাদক-উত্থান পর্ব।

প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ: 'জাগ্রত বাংলাদেশ', 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস', 'বাঙালি মুসলমানের মন', 'যদ্যপি আমার গুরু'।

উপন্যাস : 'সূর্য তুমি সাথী', 'ওঙ্কার', 'পুষ্পবৃক্ষ ও বিহঙ্গ পুরাণ', 'গাভী বৃত্তান্ত'।

কাব্য : 'জল্লাদ সময়', 'প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা', 'লেনিন ঘুমোবে এবার'।

ধ্রুপদী : 'ফাউস্ট' (অনুবাদ: মূল মহাকবি গ্যাটে), 'সংশয়ী রচনাবলী' (অনুবাদ: মূল: বার্ট্রান্ড রাসেল), ' GERMAN PERSPECTIVE '

স্বীকৃতি : বাংলাদেশ লেখক শিবির পুরস্কার, সাদত আলী আকন্দ পুরস্কার সহ অসংখ্য পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন, ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার (গৃহীত)।

আলহাজ্ব এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র আলহাজ্ব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ১৯৪৪ সালের ১ ডিসেম্বর রাউজান থানার গহিরার শান্তির দ্বীপ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আলহাজ্ব হোসেন চৌধুরী। শিক্ষা জীবন থেকে তিনি রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। স্কুল জীবনেই ছাত্র রাজনীতির সাথে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত হন। '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রথম সারির কর্মী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তী সময়ে ৬ দফা ও ১১ দফাসহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে তিনি একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনি তৎকালীন চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পরে তিনি শ্রমিক রাজনীতির সাথেও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হন। শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরীর ভাবশিষ্য তিনি শ্রমিক আন্দোলনের দীক্ষিত হন।

তিনি চট্টগ্রাম সিটি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন লাভ করার পর আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হন এবং বঙ্গবন্ধুর নিবিড় সাহচর্যে আসেন। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতেই তিনি যুদ্ধরত অবস্থায় পাক নৌ-বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। পরে অত্যন্ত কৌশলে চট্টগ্রাম কারাগার থেকে বেরিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে তিনি বাংলদেশ আওয়ামী যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠা সদস্য ছিলেন। জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরী '৭৫ পরবর্তী সময়ে বহু ঘাত-প্রতিঘাত, প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৫ রাউজান আসনে এবং ১৯৯১ সালে চট্টগ্রাম-৯ কোতোয়ালী-৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে দ্বীপাঞ্চল ও উপকূলবর্তী জনগণের জীবনে যে দুর্যোগ নেমে আসে সেই সময় এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। নগরীর উপকূলীয় এলাকার দুর্গত মানুষের জন্য তাঁর এই সেবা তাঁকে মহিমান্বিত করেছে। ১৯৯৩ সালের ২-৩ জানুয়ারী হালিশহর ও বন্দরটিলায় নৌ-বাহিনীর একদল উচ্ছৃঙ্খল সদস্য নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ চালিয়ে যে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরী। নিহতদের গোসল-দাফন তিনি নিজ হাতে করেছিলেন এবং গৃহহীন সর্বহারা মানুষগুলোর মনে ভরসা যুগিয়েছিলেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিবার্চনে এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী নাগরিক কমিটির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। মেয়রের কার্যভার গ্রহণের পর সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এই লক্ষ্য অর্জনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একাধিক আয়বর্ধক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। ফলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্বনির্ভর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে নগরবাসীর সেবার পরিধি-বিস্তারে সফল হয়। তিনি ২০০০ সালেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয়বার মেয়র নির্বাচিত হন। মেয়র হিসেবে এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁর যুগান্তকারী পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী নিজেকে একজন পুরোপুরি চাটগাঁইয়া হিসেবে ভাবতেই পছন্দ করেন। যেজন্য তিনি চট্টগ্রামকে উন্নত বিশ্বের বড় বড় নগরগুলির মতো একটি আধুনিক ও মর্যাদা-সম্পন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার এক মহৎ ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।
প্রতি বৎসর হজ্বকাফেলার মাধ্যমে ৩০০-৫০০ হাজীর হজ্ব করাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে সকল ব্যবস্থা করেন। এবং কোন হাজী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর সেবার দায়িত্ব তিনি নিজে নেন। চট্টগ্রামের উন্নয়নে সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় তিনি প্রকাশ করেছেন অনেক প্রতিবাদ। তিনি সাহসী, সফল কীর্তিমান চট্টল সন্তান। চট্টগ্রামের প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান অনস্বীকার্য। মেয়র হিসাবে তিনি শীর্ষ স্থানের অধিকারী। জনসেবায় তাঁর তুলনা নাই।

অধ্যাপক মনসুর মুসা (১৯৪৫)

অধ্যাপক মনসুর মুসা (আবুল মনসুর মুসা) চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার ধর্মপুর গ্রামে ১৯৪৫ সালের ৩১শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আবদুস সামাদ, মাতার নাম সবিলা খাতুন। তিনি ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে বিএ (অনার্স) বাংলা, ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ (বাংলা) কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন।

এর পর ইংল্যান্ডের ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৭৯ সালে এমফিল (ভাষা তত্ত্ব) ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ন্যাশনাল ব্যাংক রিসার্স ফেলো হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বৃটিশ কাউন্সিল স্কলার হয়ে ইংল্যান্ডের ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে এবং রিসার্চ ইন্টার্ন হয়ে ইনষ্টিটিউট অব কালচার এন্ড কমিউনিকেশন, যুক্তরাষ্ট্রের ইস্ট-ওয়েষ্ট সেন্টার হাওয়াইতে গবেষণা করেন।

তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৮৮ সালে অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের প্রভোষ্ট, ভাষা ইনষ্টিটিউটের পরিচালক (১৯৮৮ থেকে ১৯৯১) এবং বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক দায়িত্ব (দু'বার, ১৯৯৫-১৯৯৭ এবং ২০০২-২০০৫) পালন করেন। তিনি বাংলা একডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশসহ বহু প্রতিষ্ঠান ও সমিতির আজীবন সদস্য।

অধ্যাপক মনসুর মুসা তাঁর কর্মজীবনে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বহু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়াসহ বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমন করেছেন।

ইতিমধ্যে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা গেল: ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, পাঠকের পাঠশালা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা, মুহাম্মদ আবদুল হাই (জীবনী), মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (জীবনী), মুহাম্মদ এনামুল হক (জীবনী), জাপানের পথে, ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি অনেক গ্রন্থ ও প্রকাশনা সম্পাদনা করেছেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন।

দৈনিক আজাদী

৩০ ভাদ্র ১৪১১ সাল ১৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ২০০৪ খৃঃ

তিন দফা জানাজা ॥ গহিরায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মুক্তিযোদ্ধা রাজনীতিবিদ আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরীর ইন্তেকাল

॥ আজাদী প্রতিবেদন ॥ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ভাষা সৈনিক, রাজনীতিবিদ জনাব আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী গতকাল ভোর রাতে দেওয়ানবাজার ঈশ্বর নন্দী লেনস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে...রাজেউন)। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তিত্ব, সাবেক গণপরিষদ সদস্য আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরীর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে চট্টগ্রামের সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

২য় পৃঃ ৭ম কঃ দ্রঃ

আবদুল্লাহ আল হারুনের নামাজে জানাজা।

আবদুল্লাহ আল হারুন

রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সূচনা থেকে চট্টগ্রামে এম.এ. আজিজসহ আওয়ামী লীগের রাজনীতির কাণ্ডারী'র ভূমিকায় ছিলেন আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী। ছাত্র জীবনে ছাত্র ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন তিনি। ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট এর পক্ষে নির্বাচনে, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে ৬৬ সালে সংগঠনের সভাপতি এম.এ. আজিজ গ্রেপ্তার হলে তিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বাঙালীর মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবীতে চট্টগ্রামের প্রথম সমাবেশে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের অন্যতম সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করলে জনাব হারুন চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। রাউজানে সূর্যসেন পল্লী গঠন করেন নিজ উদ্যোগে। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে শেষ দিন পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্যন্ত ইউএসটিসি'র প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর। মৃত্যুকালে মা, স্ত্রী, তিন ছেলে, তিন মেয়ে, পাঁচ ভাই, দুই বোনসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন, রাজনৈতিক সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ী রেখে যান। তিনি ছিলেন সাত ভাই ও দু'বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। মরহুম হারুন মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ আল নোমান এর বড় ভাই।

আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী স্বাধীনতাউত্তর সময়ে চট্টগ্রাম থেকে দৈনিক স্বাধীনতা নামের একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ সকালে প্রচারিত হবার পর নগরীর বিভিন্নস্তরের ব্যক্তিবর্গ দেওয়ানবাজারস্থ বাসভবনে ভীড় জমান।

গতকাল সোমবার বাদ আছর জমিয়তুল ফালাহ মসজিদে মরহুম আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরীর প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তাঁর লাশ ইউএসটিসিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ইউএসটিসি ক্যাম্পাসে দ্বিতীয় নামাজে জানাজার পর লাশ তাঁর গ্রামের বাড়ী রাউজানের গহিরায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তৃতীয় নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ মাগরিব। পরে তাঁকে

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মোর্শেদ খান এক বিবৃতিতে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদ আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, তাঁর মৃত্যুতে চট্টগ্রামবাসী একজন সফল উন্নয়নকামী ব্যক্তিকে হারাল।

সিটি মেয়র আলহাজ্ব এ.বি.এম. মহিউদ্দিন চৌধুরী বিবৃতিতে রাজনীতিবিদ, মুক্তিযোদ্ধা আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীকার আন্দোলন ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রবীণ রাজনীতিবিদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু বলেন, হারুনের মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধকালীন এক ঘনিষ্ঠ সহচর ও নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক সতীর্থকে হারালাম

দৈনিক পূর্বকোণ

মঙ্গলবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাউজানে দাফন সম্পন্ন

প্রবীণ রাজনীতিবিদ আবদুল্লাহ আল-হারুনের ইন্তেকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক : প্রবীণ রাজনীতিক, বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, সাবেক গণপরিষদ সদস্য, অধুনালুপ্ত দৈনিক স্বাধীনতার সম্পাদক ও ইউএসটিসি'র প্রো-ভিসি আবদুল্লাহ আল-হারুন আর নেই। গতকাল সোমবার সকাল পৌণে ৮-টায় তিনি নগরীর দেওয়ানবাজারস্থ নিজ বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ২ কন্যা, ৫ ভাই, ২ বোনসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক কর্মী ও গুণগ্রাহী রেখে যান। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল-নোমান মরহুমের ছোট ভাই। আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে চট্টগ্রামে রাজনৈতিক মহলসহ সর্বস্তরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

জনাব আবদুল্লাহ আল-হারুন ছিলেন একজন ভাষা সৈনিক এবং ষাটের দশকের তুখোড় ছাত্রনেতা। '৭০ সালে তিনি প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং স্বাধীনতার পর তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও জাতীয় পরিষদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদের সদস্য হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া, তিনি দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদকসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ইউএসটিসি'র প্রো-ভিসি'র দায়িত্ব পালন করে যান। তিনি ছিলেন একজন ধর্মভীরু, অসাম্প্রদায়িক ও অমায়িক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। রাজনীতির পাশাপাশি চট্টগ্রামের উন্নয়নের আন্দোলনেও তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।

গতকাল বাদ আছর জমিয়াতুল ফালাহ্ মসজিদ কমপ্লেক্সে মরহুমের প্রথম এবং ইউএসটিসি ক্যাম্পাসে ২য় নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে, রাউজানের গহিরাস্থ গ্রামের বাড়িতে তৃতীয় দফা জানাজা শেষে পারিবারিক

● ৫ম পৃঃ ১ম কঃ

গতকাল সোমবার জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদে বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সাবেক গণপরিষদ সদস্য আবদুল্লাহ আল হারুণের নামাজে জানাজা'র দৃশ্য (ইনসেটে আবদুল্লাহ-আল-হারুন)

প্রবীণ রাজনীতিবিদ আবদুল্লাহ আল-হারুনের ইন্তেকাল

● ১ম পৃষ্ঠার পর

গোরস্থানে তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

শোক প্রকাশ

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম. মোরশেদ খান : বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ, ভাষা সৈনিক আবদুল্লা আল হারুনের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম. মোরশেদ খান গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

এক শোক বার্তায় মন্ত্রী মরহুমের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের উপর আলোকপাত করে বলেন, জনাব হারুনের মৃত্যু দেশ, জাতি তথা চট্টগ্রামবাসী একজন সফল উন্নয়নকামী ব্যক্তিকে হারাল। দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণে তথা এ অঞ্চলের কাণ্ডারী হিসেবে জনাব হারুন যে অবদান রেখে গেছেন তা সহজে ভুলবার নয়।

তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

উত্তর জেলা বিএনপি : বিএনপি'র যুগ্ম-মহাসচিব ও মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী আবদুল্লা আল-নোমানের বড় ভাই সাবেক গণপরিষদের সদস্য আবদুল্লাহ আল-হারুন চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি গোলাম আকবর খোন্দকার এবং সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ এক যুক্ত বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু : প্রাক্তন গণপরিষদ সদস্য আবদুল্লা আল-হারুনের মৃত্যুতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রাক্তন

বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (ইউএসটিসি)'র ভারপ্রাপ্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর আবদুল্লাহ আল-হারুন চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছে। ইউএসটিসি'র ক্রান্তিলগ্নে তিনি প্রো-ভিসি'র দায়িত্ব নিয়ে দক্ষতার সাথে ইউএসটিসি-কে বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে এসেছিলেন এবং সাথে সাথে প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলামের বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ইউএসটিসি'র অপূরণীয় ক্ষতিসাধিত হলো।

ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, আজ (মঙ্গলবার) সকাল সাড়ে ১০টায় ইউএসটিসি মাওলানা ভাসানী অডিটোরিয়ামে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে।

BBMH
USTC